বিকাশ-সূচনা লক্ষ্য করিতেন। কাহারও কাহারও শ্রবণে বিহঙ্গের প্রভাতী সঙ্গীতে দিবসের আহ্বান শ্রুত হইত। মনে আছে, কলিকাতায় শ্রীযুত ওয়াচার সভাপতিত্বে বিডন উদ্যানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গীত এই "বন্দেমাতরম্" গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্ত্ররচনাকালেই দেশের জাগরণের অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই গান উপন্যাসখানির পূর্ব্বে রচিত হয়। তিনি যখন এই গান রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিতেছিলেন তখন 'বঙ্গদর্শনে'র কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গান রচনা না করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে বলেন,—গানে 'বঙ্গদর্শনে'র ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক তবে তখন এ গানের মর্ম্ম বুঝিবে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্যবধানে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নব-জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সেই "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে ভারতবর্ষ মুখরিত। সুদূর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণে বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্ত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে—

"বন্দে মাতরম্।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রজনী।

[সমালোচনা।]

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। রজনী উপন্যাসে রজনীর চরিত্রের কতটা উন্মেষ হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা করিব। পূর্ণ উপন্যাস গ্রন্থখানা আমার আলোচ্য বিষয় নহে। রজনীর চরিত্র কিরূপে ফুটিয়াছে, কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে, তাহারই যথাসম্ভব বিচারে প্রবৃত্ত হইব। বুঝিতে চেষ্টা করিব,—নারীর অন্ধত্ব কি, অন্ধার পুষ্পসংসর্গ কি, নয়নহীনা পুষ্পনারীর প্রেমসঞ্চার কেমন, রূপোন্মাদ কাহাকে বলে, বিরহীর বিরহ-বেদনা কিরূপ, বিরহ-বিধুরার নিমজ্জন, উদ্ধার, মিলন কেমনে হয়! সামর্থ্যানুসারে কেবলই এ সকলি দেখিব, বুঝিব নহে, কবি তাঁহার কাব্যে যে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রসের সাগরে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া রসাস্বাদনে মগ্ন হইবার চেষ্টা করিব।

রজনীর বিষয় আলোচনা করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমেই দু'একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, রজনীই 'রজনী' গ্রন্থের নায়িকা, রজনীর চরিত্রাঙ্কনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য, অন্যান্য চিত্র ইহার চরিত্র ফুটাইবার জন্যই চিত্রিত করা হইয়াছে এবং উহার চরিত্রের সমধিক উৎকর্ষের নিমিত্তই অন্যান্য চরিত্র পরিস্ফুটনের প্রয়াস। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে সকল নায়িকা-চিত্র দেখিতে পাই, তাহার সহিত রজনীর অঙ্গগত পার্থক্য আছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রায়ই অন্ধ নায়িকা দেখা যায় না; আদিরসের গ্রন্থে যে রসসৃষ্টির জন্য নায়িকা-চরিত্রের অবতারণা করা হয় তাহা অন্ধা দ্বারা ভালরূপ ফুটিতে পারে না; সেই জন্যই কবিরা তাঁহাদের নায়িকাদিগকে প্রায় অন্ধ করিয়া

সৃষ্টি করেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা জন্মান্ধা। আলো কি, সে জানে না, অন্ধকার কি, সে বোঝে না; যে সংসারে সে বাস করে, তাহা সে কখনই দেখে নাই, ইহজীবনে দেখিবে না; যে সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হয়, সে সকল সম্বন্ধের পরিচয় দৃষ্টির সাহায্যে তাহার লাভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন, "Last Days of Pompeii"র নিডিয়া স্মরণে রজনী রচিত হয়। নিডিয়া অন্ধা সুতরাং রজনীও অন্ধা। ইহার কারণও তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন। "যে সকল মানসিক এবং নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ নায়িকা দ্বারাই বিশদরূপে ফুটিতে পারিবে বলিয়া রজনীকে ঐরূপ করা হইয়াছে।" ঐ সকল তত্ত্ব ভাল ফুটিয়াছে কি না, আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। কিন্তু নিডিয়ার ন্যায় রজনীও ফুলওয়ালী কেন? নিডিয়ার ন্যায় তাহাকেও পুষ্পনারী করিয়া সৃষ্টি করা হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। সুতরাং ইহা আমাদিগকেই বুঝিতে হইবে। কিঞ্চিৎ মনোযোগ-সহকারে যাঁহারা প্রতিভার গতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রতিভা কাহারো অন্ধ অনুকরণ করে না। সে যাহা বুঝে, তাহাই সকলকে বুঝায়, যাহা বুঝে না বা জানে না, অন্যের মুখে তাহা শুনিয়া কখনো অপরকে তাহা বুঝাইতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিচার বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা। সুতরাং লিটন নিডিয়াকে ফুলওয়ালী করিয়াছেন বলিয়াই যে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে ফুলওয়ালী করিলেন, এমন মোটা অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্রে কখনই সম্ভবে না।

বিশেষতঃ নিডিয়ার ধরণের ফুলওয়ালী বলিয়া কোনো জীব আমাদের দেশে নাই। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দেবতার অর্চ্চনাতেই পুষ্প ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ফুল দিয়া দেবতার পূজা করে, এবং পূজান্তে তাহা দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে মস্তকে ধারণ করে। বস্তুতঃ এদেশে পুষ্প

প্রধানতঃ আত্ম-প্রসাদার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আত্মভোগার্থ নহে। রাজার গৃহে কিম্বা ধনীর আবাসে পুষ্প বিলাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও দেশের জনসাধারণ ফুলের উপভোগ সদাসর্ব্বদা করে না। রোমে পুষ্প-সজ্জা সাধারণ ভাবেই ছিল। সেইজন্য সেখানে ফুলওয়ালীও ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্কা দরিদ্রা, নিঃসহায়া বালিকারা সে দেশের পথে পথে ফুলের ঝুড়ি মাথায় বহিয়া নাগরিকগণের নিকট ফুল বিক্রয় করিত। নিডিয়াও কখন বা প্রাসাদ-দ্বারে যাইয়া, কদাচিৎ বা প্রমোদকাননের উপকণ্ঠে উপবেশন করিয়া, স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাজি সাজাইয়া বিক্রয় করিত। কিন্তু এদেশে কিশোরী বা যুবতী ফুলবালা ছিল না; বর্ষীয়সী প্রৌঢ়াই মালিনীর কাজ করিত। সে মালিনী প্রধানতঃ পূজার ফুলই যোগাইত। বিবাহে বা উৎসবে লোকে পুষ্পসজ্জা করিত বটে, সে কাজ মালাকারে সাধন করিত। বঙ্কিমের মনীষা এই বৈষম্যটুকু ধরিয়াছিল। সেই জন্যই তিনি রজনীকে নিডিয়ার ন্যায় ফুলওয়ালী করেন নাই। ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি রজনীর দরিদ্র পিতাকে মালী সাজাইয়াছেন। রজনী গৃহে বসিয়াই ফুল দিয়া মালা গাঁথিত, রাজকৃষ্ণ তাহা পথে পথে বিক্রয় করিত।

ইহা না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে বাঙ্গালার হিসাবে স্বাভাবিক করিয়া, তাহাকে ফুলের সংসর্গে আনিতে পারেন না। কিন্তু তিনি ইহা করিলেন কেন? রজনীকে ফুলওয়ালী না করিলেই বা কি ক্ষতি হইত? আমরা ইহার একমাত্র সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাই। লিটনও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা জানিয়াছিলেন।

আমাদিগের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; শাস্ত্রে ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। এই সকল ইন্দ্রিয়ই বাহিরের বস্তু চিনে বা জানে। বাহিরের সকল পদার্থের পরিচয় এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই সংগ্রহ করিয়া থাকে। চক্ষু রূপ দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, নাসিকা গন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ করে, জিহ্বা নানা রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকে এবং ত্বক কোমল ও কঠোর

স্পর্শ অনুভব করে। বাহ্য পদার্থের সহিত এই সকল ইন্দ্রিয়ের যখন সম্পর্ক ঘটে, তখনই ইহারা স্ফূর্তি পায়। এই শারীরিক স্ফূর্তির জন্য অন্তঃকরণে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই দুঃখ বা সুখ। অনুভূতির এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ। কারণ চোখ যত জিনিস দেখিতে পায়, হাত তত জিনিস স্পর্শ করিতে বা নাসিকা তত গন্ধ আঘ্রাণ করিতে বা কর্ণ তত শব্দ শুনিতে বা জিহ্বা তত বস্তু আস্বাদন করিতে পায় না। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরে যে পরিমাণ সুখসঞ্চার সম্ভব, অন্য কোনো ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা সম্ভবপর নয়। ইহার অভাব লোককে যত কষ্ট দেয়, অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের অভাব তত দেয় না। এই জন্যই অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা করিবার সময় কাতর ভাবে বলে,—"যার চোখ নাই, তার কিছু নাই।" রজনীর এই চোখ ছিল না। তাহার সুখাগমের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ কি জানি কি অভিশাপে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ ছিল। সাধারণ নারী বা পুরুষ যে পরিমাণ সুখবোধ করিতে পারে এবং করে, রজনীর পক্ষে তাহা সাধ্য ছিল না। আর এই সুখবোধই আমাদিগের অন্তরের বৃত্তিসমূহকে বিকশিত করিয়া তুলে। রজনী অন্ধা; তাহার সুখও সেইজন্য সাধারণের সুখ অপেক্ষা অনেক কম হইবার কথা। এই সুখবোধ যদি সত্যসত্যই সাধারণ নরনারী অপেক্ষা অনেক কমই হয়, তাহা হইলে সাধারণ নারীর ন্যায় তাহার সকল মনোবৃত্তিরও বিকাশ ঘটিতে পারে না। সুতরাং চক্ষুহীনতার জন্য যে পরিমাণ সুখবোধ কম হয়, তাহার কতক পূরণ করিলে অন্য রমণীর ন্যায় অন্ধার অন্তরের বৃত্তিসমূহ ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই পূরণ কেবল পুষ্প দ্বারাই সম্ভব। কেহ যদি বলেন, রজনীর একটি ইন্দ্রিয় নাই—তাহার অবশিষ্ট চারি ইন্দ্রিয়েরই চরিতার্থতা সাধন কি ফুলের দ্বারা সম্ভব? আমরা বলিব, না। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক,—এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পুষ্পের দ্বারা কেবল চক্ষু নাসিকা এবং স্পর্শ,—এই তিন ইন্দ্রিয়েরই চরিতার্থতা সাধন করা যাইতে পারে। জিহ্বার তৃপ্তিসাধন

পক্ষে জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক; কিন্তু কর্ণ আছে। কর্ণ মিষ্ট স্বর শুনিতে ভালবাসে। সুতরাং তাহাকে বীণাবাদিনী করা যাইতে পারিত। কারণ বীণার স্বরের ন্যায় মিষ্ট স্বর আর নাই। কিন্তু কোনো দরিদ্র গৃহস্থ কন্যা বীণা বাজাইয়া সময় কাটাইতে পারে না। যাহারা দিন আনে, দিন খায়, লবঙ্গের অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে জীবিকানির্ব্বাহ যাহাদিগের ভার হইয়া উঠে, এমন বাড়ীর ভদ্র বাঙ্গালীর মেয়ে কথনো বীণাবাদিনী হইতে পারে না। রজনীর পিতা পুষ্পব্যবসায়ী; আর পুষ্পব্যবসায়ীর কন্যা যে পুষ্প-সংসর্গে আসিবে, ইহা কিছু বেশী বা বিস্ময়কর কথা নহে।

দৃষ্টির যে একটা মোদিনী শক্তি আছে, তাহা হইতে কেহ বঞ্চিত হইলে, স্পর্শের দ্বারা সে আহ্লাদের পূরণ করিতে হয়। যাহারা জন্মান্ধ তাহারা হাত বুলাইয়া সামগ্রীর পরিচয় গ্রহণ করে। যে অন্ধ কোমল পুষ্পরাশিই কেবল স্পর্শ করে, পুষ্পের মধুর আঘ্রাণে সদা পরিতৃপ্ত হয়, সে অন্ধের মনে কোমল ভাবের সঞ্চয় অধিক হয়। লিটনের নিডিয়া যেমন কোমল স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে, বঙ্কিমের রজনীও তদধিক কোমলা,—ভাবে ও রসে শিরীষ-পেলবা। এই অপূর্ব্ব কোমলতাটুকুতে স্বাভাবিকতার ভাব মাখাইয়া দিবার উদ্দেশ্রেই বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে গোড়ায় ফুলনারী করিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহার রজনী সত্যই রজনীগন্ধার তুল্য নিরাবিল স্বচ্ছ—অমল ধবল, এবং অতিশয় কোমল। তাহাতে কপটতার রূঢ়তার লেশমাত্র নাই। সে পরের দুঃখে নিজের সুখ ভুলিতে পারে, পরন্তু কদাচ সত্যের অপলাপ করে না।

কাহারো সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, প্রথমে তাহার উক্তিই গ্রহণ করা শ্রেষ্ঠ উপায়। পরে সে উক্তির যাথার্থতা ও স্বাভাবিকতার বিচার করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করিতে হয়। রজনী আপনার পরিচয় কিরূপ দিয়াছে, সর্ব্বপ্রথম আমরা তাহাই দেখিব। গ্রন্থারম্ভে আত্মকথা কহিতে গিয়া রজনী বলিয়াছে, "আমি বড়
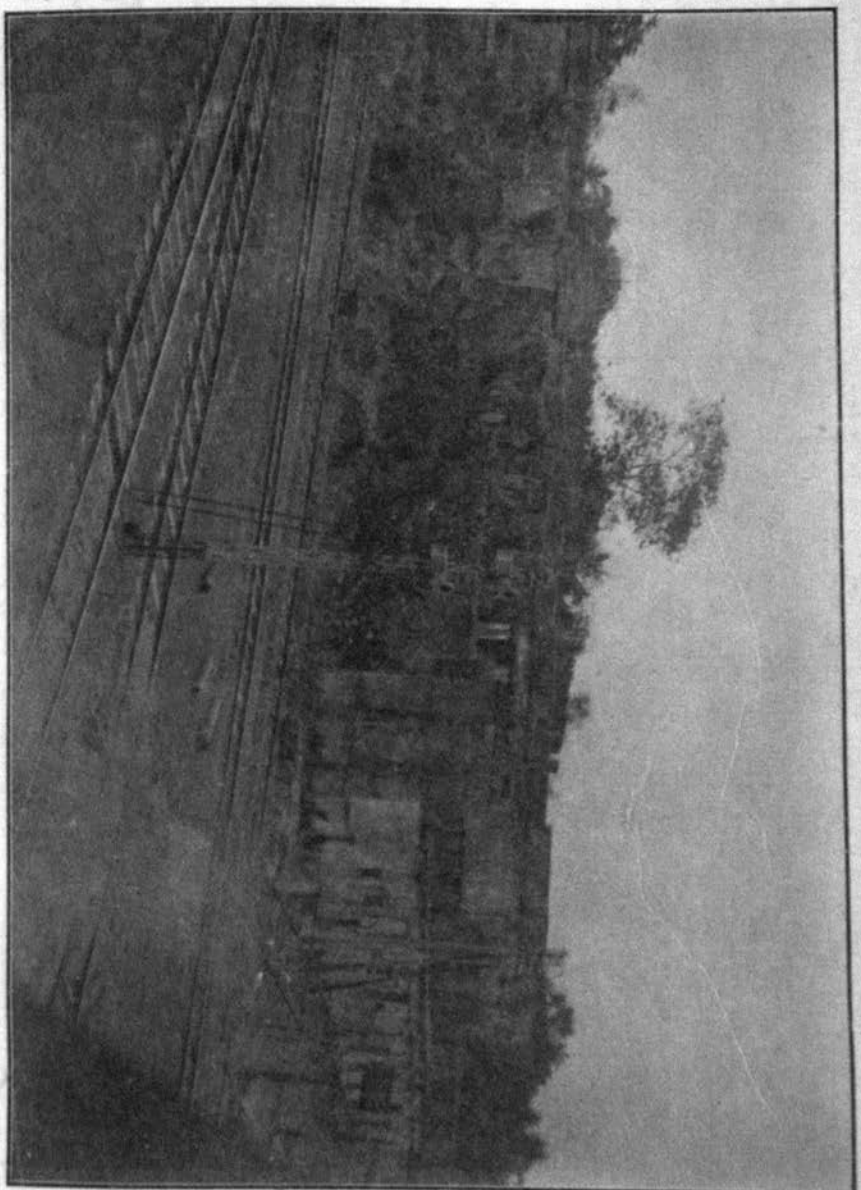
কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাটী।

দুঃখী,—আমার দুঃখের কথা কে শুনিবে?" কিন্তু দুঃখ কি? এই গ্রন্থেই একস্থলে আছে, অভাববিশেষই দুঃখ। রজনীর অভাব কিসের? তাহার অর্থের অভাব, মানুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অভাব। সুতরাং সে দুঃখী, সন্দেহ নাই। ইহাই মোটা কথা; স্থূল বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা আর একটু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। অভাববিশেষই দুঃখ সত্য; কিন্তু অভাব যতক্ষণ না অনুভূত হয়, ততক্ষণ দুঃখও অনুভব করা যায় না। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, অভাব কি অনুভব না করিয়া থাকা যায়? বরং কোনো বস্তুর সদ্ভাব সকল সময় ভালরূপে অনুভূত না হইতে পারে, সুখের অবস্থা মানুষ সকল সময় ভাল করিয়া জানিতে না পারে, কিন্তু দুঃখের অবস্থা ত জানে, অভাব ত অনুভূত হয়। কারণ দুঃখ সুখ হইতে তীব্র। দুঃখে মানুষকে পাগল করে, সুখে পাগল এমন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা ইহা মানি, স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখেরও ভাগবিভাগ আছে। যে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী, সে দুঃখের তীব্রতা ক্রমে কমিয়া আসে। মানুষ সেই দুঃখের অবস্থায় ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন আর তাহা তাহার নিকট বেশী কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয় না। অভ্যাসের ও কতকটা বিস্মৃতির শীতল প্রলেপ ক্রমে তাহার দুঃখের ক্ষতকে ভরাট করিয়া তুলে; কিন্তু সেই ক্ষততে যখন খোঁচা লাগে, তখনই আবার তাহা দগ্‌দগে হইয়া নূতন ঘায়ের মত তীব্র হয়। এস্থলে তাহার ক্ষতই তাহার দুঃখের কারণ নহে, সেই খোঁচাই তাহার কষ্টের মূল। যখন কোনো দরিদ্রা রমণী,—ছিন্ন বস্ত্র যাহার পরিধান, জীর্ণ কুটীর যাহার আশ্রয়, সামান্য শাকান্ন যাহার আহার, তুচ্ছ ভিক্ষা যাহার উপজীবিকা—এমন রমণী যখন তাহার সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করে, তখন কি তাহার দারিদ্র্য তাহাকে দুঃখ দিতে পারে? কিন্তু সেই সন্তান—অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলী,—সেই সন্তান যখন খাদ্যের অভাবে শীর্ণ হইতে থাকে এবং বস্ত্রের অভাবে মলিন মুখে মার কাছে আসিয়া উপ-

স্থিত হয়, তখনই দারিদ্র্য কি, সে তাহা বুঝিতে পারে; তখনই দারিদ্র্য-রাক্ষসী বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এইখানে দারিদ্র্যই তাহার দুঃখের কারণ নহে, দারিদ্র্য জন্ম পুত্রের শীর্ণতা এবং মলিনতাই তাহার দুঃখের কারণ।

রজনী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। রজনী সপ্তদশ বৎসর এই অবস্থায় কাটাইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ সে অন্ধা এবং দরিদ্রা; সুতরাং এতকাল পরে আপনার দুঃখ ভাবিয়া সে আকুল হইবে কেন? তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে, সে যে বিশেষ মনঃকষ্টে ছিল, এমন কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং তাহার সহসা এরূপ উক্তির অন্য কারণ আছে। আমরা ক্রমে তাহা দেখিব।

কেহ কেহ বলেন যে মানবজীবনের গতি নাকি বড় সূক্ষ্ম। সুতরাং কোনো মানুষের জীবনের গতি জানিতে হইলে, তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ বিচার করিতে হয়। তাহার যৌবন জানিতে হইলে, তাহার শৈশব জানিতে হয়, প্রৌঢ় জানিতে হইলে, যৌবন জানিতে হয়। এরূপ না করিলে তাহার জীবনের মূল সূত্রটি মধ্যে মধ্যে হারাইয়া যায়। মহাজনপদাশ্রয় করিয়া আমরাও রজনীর শৈশবের কিছু আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর শৈশবের একটি মনোরম চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। তাহাতে অন্ধের মনোভাব সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। সে পিতার মুখে মনুমেণ্টের কথা শুনিয়া তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল। বামাচরণের কান্না থামাইতে না পারিয়া তাহাকেও 'তুই আমার বর হবি' বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল। এই ইঙ্গিতেই তাহার শৈশব খুব ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। রজনীর সতের বৎসর এইরূপেই কাটিল।

এই স্থলে একটা কথা আমাদিগের মনে আসে। আজকালকার হিন্দুঘরের সতের বৎসরের অনূঢ়া কন্যা—কিছু উদ্ভট বলিয়া প্রথমে বোধ হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই ইহার কারণ একস্থলে দিয়াছেন।

রজনী দরিদ্র, অন্ধ এবং জাতিতে কায়স্থ হইলেও পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং ফুলওয়ালী। সে যদি অন্ধা না হইত, তাহা হইলে সম-অবস্থাপন্ন গৃহে তাহার বিবাহ ঘটিতে পারিত; অথবা সে যদি ধনী হইত, তাহা হইলে কোনো ধনী গৃহস্থ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত; কিম্বা তাহার যদি বিশেষ কুলগৌরব থাকিত, তাহা হইলেও বা তাহার বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু ইহার কোনোটিই তাহার ছিল না; সুতরাং সে এত বড় হইয়াও অবিবাহিতা।

ইহা ব্যতীত, আমাদিগের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র আরও এক কারণে রজনীকে অবিবাহিতা যুবতী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে যেরূপ চিত্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে রজনীকে অনূঢ়া যুবতী করা ভিন্ন অন্য কিছু করা যায় না। আমাদের দেশে হিন্দুর গৃহে অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই জামাতাকে খুঁজেন, তিনি সকল বন্দোবস্ত করেন, এবং তিনিই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বিবাহের পূর্ব্বে বরের সহিত কন্যার কোনরূপ পরিচয় হয় না। বিবাহের পরে পতিগৃহে যাইয়াই সে পতিকে ভালবাসিতে শিখে এবং ভক্তি করিতে জানে। কিন্তু রজনী স্বয়ংই পতিকে চিনিয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে নিজেই তাহাকে ভালবাসিয়াছে। এই প্রেম-সঞ্চার অল্পবয়সে সম্ভব নয়। যৌবনেই নরনারী প্রেমের মর্ম্ম বুঝে। প্রেমিকার প্রেমিকের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা যৌবনেই জাগিয়া উঠে; শৈশবে বা বাল্যে তাহার উন্মেষ হয় না। তাই রজনী অনূঢ়া যুবতী, সতের বৎসরের কন্যা।

রজনী এখন যুবতী; রাস্তায় বেড়াইয়া, মালা গাঁথিয়া, বামাচরণকে আদর করিয়া আর সে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। তাহার হৃদয় এখন যেন কাহাকে চায়? শৈশবের ক্রীড়ায় তাহার আর মন বসে না, সর্ব্বদাই শূন্যবোধ হয়।

রজনীর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সে শচীন্দ্রের কণ্ঠ

শুনিল। ইহা তাহার না জানি কেমন লাগিল; সে তৎ শ্রবণে মুগ্ধা হইল। ইহা ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন নহে, গীতব্যবসায়িনীর মিষ্ট রাগিণী আলাপ নহে, বীণার মোহন তান, বা বাদ্যের সুন্দর স্বরলহরীও নহে। তাহারা শুনিতেই ভাল লাগে, কর্ণকুহরেরই তৃপ্তিসাধন করে। কিন্তু ইহা যে কানের ভিতর দিয়া জন্মান্ধা রজনীর মরমে পশিল।

কিন্তু কেবল স্বর শুনিয়াই কি সকল যুবতী পাগল হয়? প্রেমিকের কণ্ঠস্বর প্রেমিকার হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক করিতে পারে, কিম্বা উদ্রিক্ত প্রেমকে বাড়াইতে বা গভীর করিতে পারে; কিন্তু দুটা একসঙ্গে পারে না। দর্শন যখন প্রেমের সঞ্চার করে, শ্রবণ তখন তাহাকে বর্দ্ধিত এবং গভীর করে; আবার শ্রবণ যখন প্রণয়ের সৃষ্টি করে, দর্শনই তখন তাহাকে বাড়াইয়া তোলে এবং গভীর করে। সুতরাং রজনী যে কেবল কথা—যে কথা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই, এমন কথা—শুনিয়া একেবারে শচীন্দ্রকে ভালবাসিয়া ফেলিল; ইহা কিছু অস্বাভাবিক। নয়নবিহীনা রজনীর পক্ষে শচীন্দ্রের দর্শন অসম্ভব; সেই জন্য কবি এইখানে প্রেমিকের স্পর্শ আনাইলেন। শচীন্দ্র রজনীর চিবুক স্পর্শ করিল—রজনী মজিল, তাহার দেহমধ্যে তাড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইল; আনন্দে তাহার রোমাঞ্চ হইল। সে আহ্লাদে আত্মহারা হইল। অন্ধের দৃষ্টি নাই, কিন্তু শ্রবণ ও স্পর্শনে সে অন্ধের মানবজন্ম যেন সার্থক হইল। সে ভালবাসিতে শিখিল; অনাস্বাদিত ভালবাসার আস্বাদনে সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিল। ইহাই সুখ। এতদিনে রজনী সেই সুখের পরিচয় পাইল। যেমন স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়; তেমনি প্রেমের স্পর্শে চির-দুঃখিনী রজনী ক্ষণেকের জন্য সুখের কনককান্তি ধারণ করিল। বালারুণের প্রথম স্পর্শে গাছের শুষ্ক পাতাও যেমন হেমাভ হয়, রজনীও তেমনই স্বর্ণময় হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সুখ কতক্ষণের জন্য? সুখের সে শুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল। তখন রজনীর সম্বল কেবল অতীত সুখের স্মৃতি। সেই স্মৃতির সাহায্যে সে প্রেমকে প্রগাঢ়

করিতে চেষ্টা করিল। অন্ধ জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তের আনন্দ তাহার আশাকে জাগাইয়াছে, হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব পিপাসার সৃষ্টি করিয়াছে। দরিদ্রা রজনী সে তৃষ্ণা মিটাইবে কেমনে? যুবতীগণ তাঁহাদের অতীত সুখের স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, ভবিষ্যতে সাধ মিটাইয়া পাইবার আশায় আকুল হন। এবং যখন সে সাধ মিটাই-বার সম্ভাবনা না থাকে, তখনই অভাব অনুভূত হয়, তখনই তাঁহারা নিজেদের দৈন্য এবং দুঃখ জানিতে পারেন। রজনী যখন শচীন্দ্রের কণ্ঠ শুনিল, তাহার স্পর্শলাভ করিল, তখন অন্ধ হইলেও তাহার ভিতর হইতে শচীন্দ্রের রূপের জন্য একটা কাতর ক্রন্দন উঠিতে লাগিল। তাহার চোখই নাই, হৃদয় ত আছে। যখন শচীন্দ্রের স্বর আকাশে মিশিয়া গেল, ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও যখন বায়ুতে বিলীন হইল, তখন সে কি লইয়া থাকিবে? কি অবলম্বন করিয়া তাহার প্রণয়বল্লরী বিস্তৃতি লাভ করিবে? প্রেমিকা যখন প্রেমিককে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, তখন সে তাহার রূপ ধ্যান করিয়া, মনোমধ্যে তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরহ-জ্বালা জুড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু রজনীর সে উপায় নাই। এখন সে জানিল অন্ধ হওয়া কত দুঃখের। পুটপাকের জ্বালার মতন হৃদয় পুড়িয়া যায়, তথাপি আগুন নিভাইতে পারা যায় না।

রজনীর বিরহ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; বঙ্কিমের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। সে আপনার অবস্থা ভাবিত, নিজের অন্ধত্বের জন্য সে যে শচীন্দ্রকে দেখিল না, ইহা ভাবিত; ভাবিয়া স্বীয় জীবনকে শত ধিক্কার দিত, বিধাতাকে দোষ দিত; কিন্তু শচীন্দ্রকে কখনো দোষী ভাবে নাই। আবার শচীন্দ্রের কণ্ঠ সে যখনই শুনিত, তখন তাহার কিরূপ আহ্লাদ হইত! "বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন তাহার বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়। রজনীরও এইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত।" কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বর্ষার বারিভরা মেঘের মত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়া করিয়া প্রাণভরে, কণ্ঠপুরে শচীন্দ্রের কথা কহিতে

ইচ্ছা করিত। বিরহের এমন অপূর্ব্ব চিত্র, আমাদের সাহিত্যে আর নাই। অন্ধ বিরহিণীর বিরহের ও প্রেমের বিশিষ্টতা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ফুটাইয়াছেন এমন কেহ পারে নাই।

রজনীর এইরূপ বিরহ-ব্যথা; বিরহে তাহার দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল; কান্তি মলিন হইল; মাতাপিতা ইহা দেখিলেন। দেখিয়া কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু রজনীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। হিন্দুর প্রথামত মাতাপিতা কন্যাকে এ বিষয় কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। রজনীর বয়স বেশী হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু রজনীর বয়োধিক্য ইহার ব্যতিক্রম করিবে কেন? তাহার উপর সে অন্ধ, সুতরাং তাহার মাতাপিতা ভাবিয়াছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কিছু প্রয়োজন নাই।

রজনীর বিবাহ স্থির; পিতা তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন, লবঙ্গ তাহার টাকা দিতেছেন। সে কি করিবে? সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন উভয় দিক হইতে গর্জ্জন করিয়া আসিয়া মধ্যস্থিত পদার্থকে ক্ষণেকের মধ্যে ডুবাইয়া, ভাসাইয়া, চূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনই একদিকে পিতার উদ্যোগ, অন্য দিকে লবঙ্গের উৎসাহ, রজনীর আশাভাণ্ডও বুঝি ঘটনার স্রোতে সেইরূপ ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া দেয়। বৈশাখী ঝড়ের সময় বায়ু যেমন সহসা ভীষণ বেগে আসিয়া তরুলতা ছিন্ন করিয়া দেয়, আজ রজনীর আশালতাও বুঝি সেইরূপ ছিন্ন হয়। সে কি করিবে! সে লুকাইয়া কাঁদিতে পারে, কিন্তু কাঁদিলে বিবাহ বন্ধ হইবে না। এ সময় কিসে সে বুক বাঁধিবে? কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে! কাহাকেই বা সে সকল কথা খুলিয়া বলিবে! এ অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে পারে কেবল একজন। তাহাকে কিছু খুলিয়া বলিতে হইবে না, সে যে ভাবে যাহাই বলুক না, তাহাই তাহার পক্ষে মহাসান্ত্বনাস্বরূপ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য আর একবার রজনীকে শচীন্দ্রের সহিত মিলাইলেন। রজনী কাঁদিতেছে দেখিয়া শচীন্দ্র তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলেন, তাহার হাত ধরিয়া উপরে আনিলেন।

রজনী তখন উন্মত্তা হইল। সে বিবাহের কথা ভুলিয়া গেল। উভয়ের মিলনের কথা ভুলিয়া গেল, বিবাহবন্ধের কথা ভুলিয়া গেল,—সকল ভুলিয়া শচীন্দ্রকে স্বামীপদে বরণ করিল।

এখন সে বিবাহবন্ধের জন্য সব করিতে সমর্থ এবং প্রস্তুত। যাহার জন্য ইহা সে করিতে পারে, সে যে তাহার স্বামী,—হৃদয়-দেবতা। প্রথম সাক্ষাতে রজনী শচীন্দ্রকে পতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সে তাহাকে ভালই বাসিয়াছিল,—অন্য কোনো সম্বন্ধের সৃষ্টি উভয়ের মধ্যে তখনো হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই বিবাহে বাধা দিবার রজনীর কোনো বিশেষ শক্তি ছিল না। তখন পর্য্যন্ত শচীন্দ্র পর-পুরুষ। পরপুরুষের জন্য সে গৃহত্যাগ করে কি করিয়া। কিন্তু এখন চাঁপার সহিত যাইতে তাহার কোনো দ্বিধা উপস্থিত হইল না। সে রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া চলিল। কিন্তু হীরালালের সহিত রাত্রে যাইতে তাহার আপত্তি হইল। রমণীর স্বাভাবিক সতীত্বজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। তাহার আপত্তি টিকিল না, সে গেল; কিন্তু হীরালালের লাঠীর অর্দ্ধখণ্ড নিজহস্তে লইয়া গেল। রজনী অন্ধা এবং সরলা হইলেও সে যে সংসারানভিজ্ঞা নহে, ইহা তাহার প্রমাণ।

ইহার পর হীরালাল যখন তাহাকে কিছুতেই বিবাহে সম্মত করাইতে না পারিয়া নদীসৈকতে রাখিয়া চলিয়া গেল, তখন রজনীর কি অবস্থা! ঘোর নিশা, মানুষের কণ্ঠশব্দ নাই, রজনী কোন শব্দই শুনিতেছে না। সে যে একাকিনী, নিস্তব্ধতার স্পর্শে তাহা সে বুঝিল, এবং ইহাও বুঝিল যে তাহার চারিদিকে জল, মাঝখানে অন্ধ যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে দুঃখের চরম সীমায় উপস্থিত। তাহার সুখের আশা-প্রদীপও এখন নিভিল, শেষ অবলম্বনও সে হারাইল। সে অন্ধা এবং যুবতী; কে ইহাকে উদ্ধার করিবে,—কি করিয়াই বা সে শচীন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে? সে ভাবিয়া কূল পাইল না; ভবিষ্যৎ অনুভূতি শূন্য নৈরাশ্যময়, আশার কোন বোধই তাহার নাই। প্রথমে হীরালালের উপর তাহার ক্রোধ হইল। ক্রোধে

জ্ঞান হারাইয়া সে হীরালালকে মারিল। পরে দুঃখ হইল, জীবন দুঃসহ বোধ হইল। দুঃখে পাগল হইয়া সে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রজনীর জীবনাভিনয়ের প্রথম অঙ্ক এইখানেই শেষ হইল। এই খানেই যদি ইহার যবনিকা পতিত হইত, তাহা হইলে রজনীর চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; রজনী 'রজনী' হইত না, আমরাও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে শচীন্দ্রের সহিত রজনীর মিলন এখনো সংঘটিত হয় নাই বলিয়াই আমরা এ কথা বলিলাম। নিডিয়া তাহার প্রণয়ীর সহিত মিলিতে পারে নাই; সেও নদীবক্ষে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু তথাপি নিডিয়ার চিত্র অসম্পূর্ণ নহে। ইহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ। কিন্তু নিডিয়ার এবং রজনীর বিসর্জ্জন এক নহে। উভয়ের অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ। রজনী এতাবৎকাল যাহা করিয়াছে তাহার প্রভাবে মনুষ্য-সামান্য ধর্ম্মই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার মধ্যে যে দেবতা আছেন, তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহার অবস্থার এবং তাহার বয়সের প্রায় সকল রমণীই তাহা করে। ফলতঃ তাহার জীবনের বিশেষত্ব এখনো পরিস্ফুট হয় নাই।

এই বিশেষত্বটি ফুটাইয়া তোলাই কবির কবিত্ব। সকলের বিশে-যত্ব এক সময়ে বা এক অবস্থায় ফুটিয়া উঠে না। বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে ইহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই বিশেষত্ব যখন ফুটিয়া উঠে, তখনই মানুষের জীবন সার্থক হয়। হিন্দুর মতে ইহা সকলের মধ্যেই আছে, এবং সকলের মধ্যেই ফুটে। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ তাহার "পতিতায়" 'সুপ্ত দেবতা' বলিয়াছেন। এই দেব-তাকে জাগাইয়া তোলাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। রজনীর দেবতা এখনো জাগে নাই।

কিন্তু তাহার এই বিসর্জ্জনেই ইহা জাগিল। অগ্নিতে সোনা

রাধাবল্লভের রথ।

(৫১৩ পৃষ্ঠা)

BIJOYA PRESS
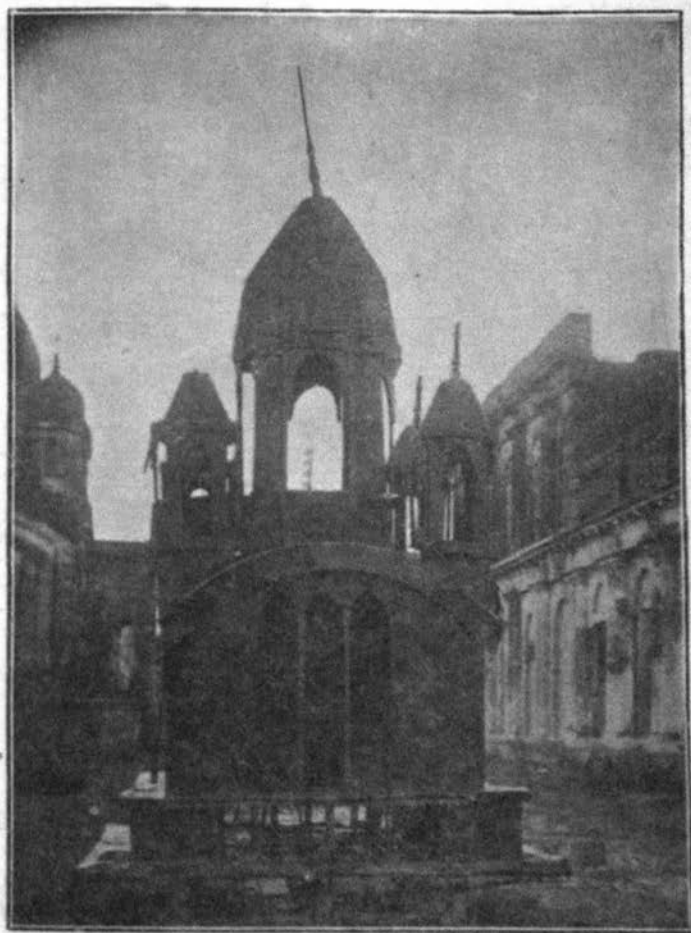
পোড়াইলে যেমন তাহার খাদ নষ্ট হইয়া খাঁটী সোনা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, রজনীর বিসর্জ্জনেও তাহার হীনধাতুত্ব টুকু নষ্ট হইয়া যাহা সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকর, তাহাই অবশিষ্ট রহিল। ইহা দ্বারা রজনীর চরিত্র যে নিন্দনীয় এমন কথা বলি না। কিন্তু তাহার বিশেষত্বও যে আগে ফুটে নাই, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদিগকে দিয়াছেন। রজনী যখন বিবাহে অসম্মতা হয়, তখন সে নিজের কথাই ভাবিয়াছিল, চাঁপার কথা ভাবে নাই। চাঁপা যে সপত্নী-সহবাসে ক্লেশ পাইবে, সে যে ঈর্ষানলে পুড়িয়া মরিবে, একথা তাহার মনে আসে নাই। অবশ্য যদি আসিত তাহা হইলে 'রজনী'র সৌন্দর্য্য নষ্ট হইত, স্বাভাবিকত্ব ঘুচিয়া যাইত। প্রথম প্রণয়ের তীব্র মোহ এবং গাঢ় সঙ্গলিপ্সা প্রেমিক কিম্বা প্রেমিকাকে অন্যের কথা ভাবিতে দেয় না। রজনীও সেইজন্য তখন চাঁপার কথা ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু অমরনাথের সময় সে পারিয়াছিল। কারণ মোহ তখন অনেকটা কাটিয়াছে, সামান্য আসক্তি আর তাহার হৃদয় জুড়িয়া নাই। গভীর প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রজনী যে "অমরনাথের ইচ্ছায় তাহার দাসী" হইতে চাহিয়াছিল, শচীন্দ্রকে ইহলোকের জন্য ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহার কারণ কেবল ইহাই নহে। এ পর্য্যন্ত রজনী অত্যাচারই পাইয়াছে, অবিচার এবং নিগ্রহই সহ্য করিয়াছে,—উপকার পায় নাই। লবঙ্গ তাহার উপ-কার করিতে চাহিয়াছিল, সত্য, কিন্তু রজনীর পক্ষে তাহা উপকার হয় নাই। সে দেখিল এমন পর জগতে আছে, পরের জন্য যাহার হৃদয় কাঁদে, এমন মানুষ সংসারে আছে, রজনীর দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় বিগলিত হয়। তাহার উপর অমরনাথ রজনীর উদ্ধার-কর্ত্তা। সুতরাং রজনী তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞা। অমরনাথের মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া রজনীর সদ্‌বৃত্তিসকলও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দীপ-শলাকার স্পর্শে পুঞ্জীভূত বারুদরাশি যেমন একেবারে জ্বলিয়া উঠে, অমরনাথের চরিত্র-সংস্পর্শে রজনীর হৃদয়ও সেইরূপ আলোকিত হইল

—চতুর্দ্দিক তাহার বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হইল। এতদ্ব্যতীত রজনী অমরকে ভক্তি করিত। এরূপ ভক্তি বোধ হয় সে আর কাহাকেও করিত না। মানুষ যাহাকে ভক্তি করে, তাহাকে সহজে ক্লেশ দিতে পারে না। রজনী যখন শুনিল, অমরনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, তখন সে আপনার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। নানারূপ চিন্তায় তাহার অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল। একদিকে তাহার জীবন, জীবন কেন জীবন অপেক্ষাও প্রিয়বস্তু, অন্য দিকে অমরনাথের সুখ। শেষে তাহারই জয় হইল। শয়তান নিষ্পেষিত হইল;—তৎপরিবর্ত্তে তাহার সুপ্তদেবতা জাগিয়া উঠিলেন। সে স্থিরভাবে ধীর ভাষায়, অবিকম্পিত কণ্ঠে লবঙ্গকে বলিল, "তাহা হইবে না; তিনি যখন আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, আমি তাঁহারই হইব, আর কাহারো নহে।"

কিন্তু রজনী অমরের নিকট কিছুই লুকাইল না। সব বলিল, "তাহার হৃদয় যে শচীন্দ্রের পদে বিক্রীত, তাহা বলিল, সে যে অমরনাথের উপযুক্তা নয়, তাহাও বলিল।" অমরনাথ সমস্ত শুনিল; শুনিয়া রজনীকে ছাড়িল, শুধু ছাড়িল না, শচীন্দ্রের সহিত মিলাইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জন্মান্ধা রজনীর রূপোন্মাদ নাই। শ্রবণে ও স্পর্শনে যে রূপ, সেই রূপের আংশিক উন্মাদনায় রজনী কিছুকাল প্রেমবিধুরা হইয়াছিল। পুষ্পসংস্পর্শে রজনী চিরকোমলা এবং চিরসরলা। সে শুনিয়াছিল উপকারকের প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাই সে অমরনাথের বিবাহ-প্রস্তাবে অসম্মতা হয় নাই। সে ফুলের ঘ্রাণে, ফুলের স্পর্শে মাধুর্য্যই সংগ্রহ করিয়াছে; তাই অমরনাথের মাধুর্য্য-মণ্ডিত ব্যবহারে সে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইল। রজনী কর্ত্তব্যপরায়ণা, কিন্তু কুটিলা নহে। সে আত্মগোপন করিতে পারিল না, সকল কথা খুলিয়া বলিল। তাহার ত চক্ষুলজ্জা নাই। তাহার স্ত্রী আছে,

কিন্তু ব্রীড়া নাই, কারণ সে যে জন্মান্ধা! এই বিশ্লেষণেই বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে।

রজনীর শেষ চিত্র মাতার চিত্র। যে রূপ নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ, শেষে আমরা রজনীকে সেই মাতৃরূপে দেখিলাম। আমাদের নয়ন সার্থক হইল।

শ্রী—

—

বঙ্কিমবাবু।

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি বঙ্কিমবাবু; পরমারাধ্য জননী দেবীর মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু, অগ্রজদিগের মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু; তাই এই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম বঙ্কিমবাবু। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেটুকু স্মৃতি তাহাই জ্ঞাপন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে এ স্মৃতি আমার পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতির সহিত কতক জড়িত।

সম্প্রতি একদিন আমার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় বঙ্কিমবাবুর রং কি কাল ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাল বলিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহার দাড়ি গোঁফ কামান, চোগাচাপকান আবৃত চেহারা দেখিয়াছিলাম, তাহার রং কালই বোধ হইয়াছিল। এরূপ ধারণা হয় ত আরো অনেকের থাকিতে পারে, সেই জন্য প্রথমেই তাহার বর্ণের কথা বলিব। তাঁহার গুরুর ভাষায় বলা যাইতে পারে তাঁহার রং "কষিত কাঞ্চন" ন্যায় ছিল। বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে, তিনি একদিন আমার পিতৃদেবের সহিত গল্প করিতেছিলেন। দুইজনে দুটি তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ শায়িত ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর গায়ে একটি পাতলা দুগ্ধফেণনিভ লংক্লথের কোট ছিল। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার রং ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার নিজের উপমা ব্যবহার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়া আলো যেমন অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাঁহার রংও সেই কোটের আবরণে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। গোঁফ ও কেশ ঘন ও মিসমিসে কাল। তাঁহার এই সময়ের ফটো আমাদের আছে। বঙ্কিমবাবুপ্রণীত "দীনবন্ধু-জীবনী"র শেষ সংস্করণে ঐ ছবির হাফ্‌টোন প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। "মানসী"তে বোধ হয় এই ছবি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পাঠ্যাবস্থায় যখন বঙ্কিমবাবু ও আমার পিতৃদেব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-

শিষ্য ছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহাদের পত্রে আলাপ হয়। পরে তাঁহাদের যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের অবিদিত নহে। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহারা কেবল দুইজনে বসিয়া থাকিতেন তখন অনেক সময় নীরবে কাটিয়া যাইত। দুইজনে দুইটি গুড়গুড়ি লইয়া ধূম পান করিতেন এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণও কাটিয়া যাইত। শুনিয়াছি কারলাইল ও এমারসন্ উভয়ের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, দুইজনে দুইটি চুরুটের ধূম বাহির করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় তাহাদের আত্মায় আত্মায় কথা হইতেছিল, বাহেন্দ্রিয়ে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের এই দুই মনীষী বন্ধুরও সেইরূপ নীরব কথোপকথন হইত। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পরও বঙ্কিমবাবু এই নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম-বাবু স্থির ছিলেন। বঙ্গদর্শনে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অনেকেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং সেজন্যই তিনি বঙ্গ-দর্শনের বিদায় গ্রহণে এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন,—

"আমার আর একজন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী, তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই; কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু। আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখন কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না।" এরূপ অতলস্পর্শী সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত আর আছে কি!

তাঁহার আর একজন প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। ইনি "পণ্ডিতাগ্রণী কাব্যামোদী" ৺জগদীশনাথ রায়। বঙ্কিমবাবু উভয়কে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার কলিকাতার বৈঠকখানায় তাঁহার পিতৃদেব ও তাঁহার নিজের তৈলচিত্র দেখাইয়া কহিলেন, ঘরে স্থান নাই, নহিলে কয় ভায়ের, দীনবন্ধু ও জগদীশের ছবি রাখিতাম। অনেকেই হয় ত জানে না যে এই জগদীশবাবুই বিষবৃক্ষের 'হরদেব ঘোষালে' কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠি পত্র চলিত। এ কথা জগদীশবাবুর পুত্র ভক্তিভাজন বাবু খগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট শুনিয়াছি।

অনেক স্থলেই দেখা যায় যে বন্ধুত্ব বন্ধুর মৃত্যুর সহিত ফুরাইয়া যায়। আমার পিতৃদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর বন্ধুত্ব সে জাতীয় ছিল না। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। সততই আমাদের সংবাদ লইতেন। আবশ্যক হইলে সৎপরামর্শ দান করিতেন। তাঁহার দ্বারা যে উপকার সাধন হইতে পারে তাহা করিতে কখনই বিরত হয়েন নাই। তিনিই পিতৃদেবের রচনাগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করিতে বলেন এবং নিজে পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনীও লিখিয়া দেন। ইহা পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি ইহাকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবার অনুমতি দেন এবং এই জীবনী সে অবধি আমাদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার উপস্বত্বও আমরা ভোগ করিতেছি। মৃত বন্ধুর পুত্রগণের প্রতি এই স্নেহের চিহ্ন অতীব বিরল। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। কেহ কেহ বলেন, অনেক স্থলে ঋণ স্বীকার করা ঋণ পরিশোধের কতকটা উপায়। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ঋণ স্বীকার করিতেছি। পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার সময় তিনি আমাদিগকে একখানি ইংরাজী পত্র পাঠান। তাহার

আরম্ভে লিখিয়াছিলেন—"I owe it to the memory of your father that I should give a critical estimate of his writings" এবং বিজ্ঞাপনে একথা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সমালোচনার পূর্ব্বাভাস এই পত্রে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন —"কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি-ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় তিনি আমার পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক নীরবে বহন করিয়াছিলেন। কাহারও নিকট যে কাঁদিয়াছিলেন তাহাও শুনি নাই। শোক তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন আমাদের বাটীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাহার ক্ষত হৃদয়ের শোকরাশি সেতুবন্ধনে জলসংঘাতের ন্যায় উছলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া, আমাদের বালিকা সহোদরাকে ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে কল্যকার ঘটনার ন্যায় জাগিয়া আছে। সে দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিব না।

তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চিহ্ন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে নবীন তপস্বিনী নাটক উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাকে মৃণালিনী উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই তাহা দেখাইবার জন্য আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বর্গে মর্ত্তে

সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।" ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন তাহার বন্ধু হ্যালামকে ভুলিতে পারেন নাই। কাব্যে ইহার অমর নিদর্শন আছে। যদি বীজের সহিত বৃক্ষের তুলনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে আনন্দ-মঠের উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের In Memoriam. সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর আবার সেই দুই বন্ধু পুনরায় মিলিত হইয়াছেন। সে মিলন অনন্ত কালের জন্য, তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। মৃত বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া তিনি যে আপনাকে "ত্বদধীন জীবিতঃ" বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই সত্য। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ পূর্ণবাবু একদিন আমাকে বলেন,—তোমার বাবার মৃত্যুর পর বঙ্কিবাবুর জীবনের পূর্ব্বকার অবস্থা আর দেখি নাই। যেন তাঁর জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুরের প্রণীত "চন্দ্রজিৎ" নামক নাটকের অভিনয় দর্শনকালে একটি কথা বড় মনে লাগিয়াছিল। রাজা 'চন্দ্রজিৎ' বলিতেছেন—"রাজর্ষির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে সব মনে রাখা। স্মৃতির প্রত্যেকটিই সজাগ রাখিলে স্মৃতি বিলোপনের উপায় সুসাধ্য, নচেৎ কর্ম্মক্ষয়কালীন কোন না কোন লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।" বঙ্কিমবাবু সাহিত্য-জগতের রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারও ঐরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল। আমার পরলোকগত বন্ধু ৺শরৎকুমার লাহিড়ী বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির পরিচায়ক একটি গল্প করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি: একবার বঙ্কিমবাবু "সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত, সকলে বিদিত" রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। শরৎবাবু তখন তরুণ বয়স্ক। বয়সের চাপল্যনিবন্ধন তিনি বঙ্কিমবাবুর নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার একখানি ফটো চাহেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলেন যে, এক্ষণে তাঁহার আর ফটো নাই; যদি

গুঞ্জবাড়ী।

৫১৫ পৃষ্ঠা।

BIJOYA PRESS

ভবিষ্যতে কখন আবার ফটো তোলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একখানি দিবেন। ইহার বহু বৎসর পরে যখন কলিকাতায় অবস্থানকালে পুনরায় ফটো তোলেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারী উমাচরণকে বলেন যে, রামতনুবাবুর পুত্র শরৎকে একবার আসিতে বলিও। শরৎ-বাবু তাঁহার পিতৃসুলভ সরলতার সহিত স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পুস্তকের দোকান তখন বেশ চলিতেছে। তিনি S. K. Lahiri নামেই অভিহিত। তিনি ভাবিলেন তাঁহাকে প্রকাশক করিবার জন্যই বুঝি বঙ্কিমবাবু ডাকিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমবাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াই-লেন এবং পরিচয় দিলেন যে তিনি S. K. Lahiri. বঙ্কিমবাবু শুনিয়া তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "উমাচরণ উমাচরণ, তুমি কাকে ডাকিয়াছ, আমি যে রামতনুবাবুর ছেলে শরৎকে ডাকিতে বলিয়াছি।" শরৎবাবু অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "আমিই শরৎ"; তখন তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কৃষ্ণনগরে যখন তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, আমার কাছে ফটো চাহিয়াছিলে মনে পড়ে?" শরৎবাবুর সে কথা আদৌ স্মরণ ছিল না, তাঁহার বলার পর মনে পড়িল। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, "আমি আবার ফটো তুলিয়াছি, প্রথম উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি।" বঙ্কিমবাবু যে এই সামান্য কথাও বিস্মৃত হন নাই তাহা দেখিয়া শরৎবাবু চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ সামান্য কথা স্মরণ রাখি-বার ক্ষমতার পরিচয় আমিও একবার পাইয়াছিলাম। University Instituteএ বেদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত হয়। বঙ্কিমবাবুর প্রথম বক্তৃতা আমি শুনিতে গিয়াছিলাম। বসিবার স্থান পাই নাই—দাঁড়াইয়াছিলাম। বহু জনতার জন্য কিছুই শুনিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে চলিয়া আসিলাম। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বক্তৃতাটি ছাপা হইবে কি না? তিনি বলিলেন, University Magazineএ ছাপা হইবে। পরে অন্য কথা হইয়াছিল। বক্তৃতাটি পড়িবার জন্য

আমার অব্যক্ত আগ্রহ তিনি বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর আমার তৃতীয় অগ্রজ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে যান। আসিবার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "এই Magazine তুমি ললিতকে দিও, তাহার আমার বক্তৃতাটি পড়িবার ইচ্ছা আছে।" আমি কাগজ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি যে আমার আগ্রহটি মনে রাখিয়াছেন তাহাতে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইল। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, পড়িয়াছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় অচিরেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইল না। বঙ্গদেশের কেন, সমস্ত শিক্ষিত জগতের দুর্ভাগ্য যে ঐ বক্তৃতা সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। Vedic Literature সম্বন্ধে ইহা যে এক অমূল্য পদার্থ হইত, সন্দেহ নাই। এইবার তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমোন্নতির অবতারণা করিয়া উপসংহার করিব।

সাহিত্য-জীবনের শৈশবকাল তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'সাহিত্য-পাঠশালায়' অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার দুই জন সতীর্থ ছিলেন—৺দ্বারিকানাথ অধিকারী ও ৺দীনবন্ধু মিত্র। গুপ্ত কবি ইঁহাদের তিনজনকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিতেন। একবার ইঁহাদের তিন জনকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কখন কখন কবিতায় কলহ হইত। সেই সব কবিতা "কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রভাকর পাঠে জানা যায় তদানীন্তন লোকে ইঁহাদের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে যুগান্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে আশাও পূর্ণ হইয়াছিল। তবে বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ ৺দ্বারিকানাথ অধিকারী 'নীলদর্পণ' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় কোন পুস্তক রচনা করিবার পূর্ব্বে অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা মুকুলেই শুখাইয়া গেল। অপর দুই জন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ অবলম্বন করিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর একজন সহযোগী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যে, নাট্যে ও

উপন্যাসে তাঁহারা এক সময়েই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিন পুণ্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় একত্র যুক্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গমকে সাহিত্যের প্রয়াগতীর্থ বলা যাইতে পারে। যদি বিদেশী উপমা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের এই দিব্য যুগকে Literary Triumvirate নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এবং মধুসূদন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র Literary Triumvirs বা সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ ছিলেন। এই ভাব-অবলম্বনে মৎকর্ত্তৃক রচিত একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত করিলাম,—

মহাকবি মাইকেল পুরুষ বিরাট,
হাস্যসিন্ধু দীনবন্ধু দীনের তারণ,
বঙ্কিম মাধুর্য্যমণি কোরকসম্রাট,
একাধারে রাজদণ্ড করিল ধারণ।
ধন্য মাতা বঙ্গভাষা বড় ভাগ্য তোর,
সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ সিংহাসনে তোর।

বঙ্গসাহিত্যের, বঙ্গদেশের, বঙ্গসমাজের, চির আক্ষেপের বিষয় এই ত্রয়াধিপের দুইজন—মধুসূদন ও দীনবন্ধু ১২৮০ সালে, চারিমাস ব্যবধানে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহাদের পরলোক গমনের পর 'কোরক সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র একছত্র সম্রাট হইলেন। সম্রাটের কার্য্য—পালন ও শাসন করা। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুই কার্য্যই সম্যকভাবে করিয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বীয় কল্পনাপ্রসূত রচনায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে সাহিত্যে জঞ্জালের প্রবেশ রোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ বৎসর যাবৎ সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই পালন ও শাসন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের সব্যসাচী বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎকর্তৃক রচিত আর একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব,—

এক হস্তে দিব্যতান বীণার ঝঙ্কার
অন্য হস্তে শক্তিশেল কঠোর সন্ধান
দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিলে মহান্।
সাহিত্যের রাজসূয় তব অনুষ্ঠান,
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ সমাধান।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র।

মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,—"ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক" এবং "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"। তখনও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাঁহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ইউরোপে তখন ফরাসী ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের আবিষ্কারের ও আলোচনার দরুণ, বাইবেল-বর্ণিত প্রাচীন ইহুদী জাতির ইতিহাস যে সত্য ইতিহাস নহে, কিন্তু কল্পনাবহুল কিম্বদন্তি মাত্র, এ কথার প্রচার হইয়াছে। ধর্ম্মভীরু খৃষ্টীয়ান্ পণ্ডিতগণ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংঘর্ষে পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজ বিনষ্ট হইবার ভয়ে, বাইবেলের ঐতিহাসিক অংশের অসত্য গুলিকেও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। অপর পক্ষে যাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মিসর, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যের ভগ্ন স্তূপ খনন করিয়া প্রাচীন জগতের লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাইবেলের কোন অংশকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এই দ্বন্দ্বের ফলে ইউরোপে ইতিহাসের আলোচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জগতের ইতিহাসের ধাত্রী ইউরোপে যখন ইতিহাস চর্চ্চার এই অবস্থা, তখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মার্স্‌ম্যান, এবং ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস ব্যতীত এত-

দেশে ইতিহাসবিষয়ক অপর পাঠ্য পুস্তক ছিল না। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন-উক্তির মতন বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রকাশের পরে বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না। এখনও কোন লেখক এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, মুসলমানগণ যত সহজে প্রাচীন সিরিয়া বা পারস্যদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষও সেইরূপ অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র* কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, 'র‍্যাভার্টি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'তাজ্-উল-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র সারাংশ মাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১২৮৭ সালে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

"সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজী কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সেসকল দেশে কে রাজা ছিল? কি প্রকারে অবশিষ্ট অংশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?"

বাস্তবিক মার্স্‌ম্যানের ইতিহাস পাঠ করিয়া যাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যাঁহাদের নিকটে স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সকল প্রশ্ন আশা করা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' পড়িতে পড়িতে এই প্রশ্নগুলি দেখিয়া মনে বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল। সেই দিনই ইহার সদুত্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। একার্য্যে অনেক সময় লাগিয়াছিল। কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা দেশের আরও দুই একজন ঐতিহাসিক অবগত আছেন। রাজশাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বোধ হয় বলিতে পারেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নগুলির সদুত্তর বাহির করিতে লেখকের কত সময় লাগিয়াছিল। যে সকল উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তাহা 'লক্ষ্মণসেন ও মুসলমান বিজয়' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি (বঙ্গদর্শন, ১৩১৫)। তৎকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও অন্যান্য দুই একজন বঙ্গদেশীয় লেখক আমার সিদ্ধান্তগুলিকে কিছুতেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। ব্যক্তিবিশেষের মতামতে কিছু আসে যায় না। রমাপ্রসাদ বাবু 'অদ্ভুত সাগর ও দানসাগরে'র কতকগুলি শ্লোকের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অন্যান্য লেখকগণ পুরাতন মতের সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক আশ্চর্য্য কথার অবতারণা করিয়াছেন। অনেকদিন পরে আবার "বিবিধ প্রবন্ধ" পড়িতে

পড়িতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, নব-শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রত্ন-প্রীতির কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

"কিন্তু সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোল-কল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরি হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?

"ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতেরজন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনু-মত? যদি তাহা না হয়, হে চাকরিপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?"

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;—

"পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? সেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কি প্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠা-নেরা কস্মিনকালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, উপনিবেশের পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানসকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত।"

যদি কখনও 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানের চেষ্টা করিব।

ইতিহাসের উপাদান পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তাঁহার অযোধ্যার জাইগীর হইতে চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এইরূপ লুণ্ঠন করিতে আসিয়া মগধদেশের প্রধান নগর উদ্দণ্ডপুরের সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। পর্ব্বতশীর্ষে পাষাণ-নির্ম্মিত সঙ্ঘারাম দেখিয়া মুসলমানেরা

রাধাবল্লভের মেলার স্থান।
(এখন রেলওয়ের অধিকারভুক্ত)
৫১৩ পৃষ্ঠা।

BIJOYA PRES

দুর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং অনায়াসে নিরস্ত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু-দিগকে সংহার করিয়া সঙ্ঘারাম অধিকার করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ মুসলমান বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে বখ্‌তিয়ারের সহচর দুইজন সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই নিরক্ষর, গর্ব্বান্ধ, বৃদ্ধ সৈনিকদ্বয়ের প্রলাপোক্তি অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মিন্‌হাজের গৌড়-বিজয়-কাহিনী প্রকৃত ইতি-হাসে স্থান পাইতেছে না। তাঁহার ইতিহাসে কোন্ পথে বখ্‌তিয়ার গৌড়ে গিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই; কে, কেমন করিয়া গৌড়-রাজ্যের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই; গৌড়রাজ্যের কতটুকু অধিকৃত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে মিন্‌হাজের বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দিল্লীর চাহ-মান বংশ অথবা কান্যকুব্জের গাহড়বাল বংশের পরাজয়-কাহিনীর সহিত গৌড়ের সেনবংশের অধঃপতন-কাহিনীর তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শেষোক্ত বিবরণ বাতুলের প্রলাপ অথবা মূর্খের অসম্বদ্ধ কাহিনী।

মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা,—১১৯৯ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া অধিকৃত হয় নাই; যদিই বা হইয়া থাকে তাহা হইলে হিন্দুগণ উহা পুনরধিকার করিয়াছিল; লক্ষ্মণসেন মুসলমান-বিজয়ের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বিজিত হয় নাই। সুতরাং এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে বখ্‌তিয়ার বোধ হয় কেবল রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভি-ষিক্তের শাসনকালে উত্তরে দেবকোট, ও দক্ষিণে লক্ষ্মণোর পর্য্যন্ত বিশাল বঙ্গদেশের শতক্রোশব্যাপী অংশমাত্র মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছিল। "বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজী বহুতর সৈন্য লইয়া

বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন ;—ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজী জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজী সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"

উত্তরবঙ্গের সপ্তম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বলিয়াছিলেন, "অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিলনা, সে কথার বিচার তখন মনে আসে নাই। তিনি যে সাহসপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে লইয়া দেশকে অনুসরণ করিতে ডাকিতেছেন ইহাই যথেষ্ট।" তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথাই বোধ হয় অক্ষয়কুমারকে 'সিরাজদ্দৌলা' রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। সে কথাটি এই, "ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাস মাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্‌-তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্লৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্‌খরীন্‌ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" এখন বাঙ্গালার অনেকগুলি ভাল ভাল ইতিহাস লিখিত হইয়াছে,—কুলশাস্ত্রের ন্যায় স্বকপোল-কল্পিত রচনা অথবা পিতামহীর গল্প নহে। আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণপ্রান্তে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বাঙ্গালার ইতিহাস স্থাপন করিয়া প্রবীণ ও নবীন অনেক ঐতিহাসিক আপন

আপন পরিশ্রম সফল হইল, মনে করিতেন। বাঙ্গালার কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে কান্যকুব্জের বা চৌরবংশের কলঙ্কও অপনোদিত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কারের উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, "Effeminate Hindoo" কথাটি মিথ্যা। তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরাপথ বিজিত হয় নাই, যূথভ্রষ্ট চাহমান বীরগণ পদে পদে মুসলমানের গতিরোধ করিয়াছিলেন ; আজমীর বিজয়ের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র অভিযানের আবশ্যক হইয়াছিল ; দিল্লী পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। এ সকল কথা "গোহত্যাকারী ক্ষৌরিত-চিকুর" মুসলমান ঐতিহাসিকেরই কথা, হিন্দুর নহে। তাজ্-উল-মাসির এবং কামিল-উৎ-তওয়ারিখ্ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়ে এই সকল ঘটনার বিবরণ আছে। যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জয়চ্চন্দ্র আত্মবলিদান দিয়া স্বদেশ-দ্রোহীতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধান্তে বিশাল গাহডবাল সাম্রাজ্য মুসলমানের পদানত হয় নাই। জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর সাত বৎসর পরেও তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কান্যকুব্জ রক্ষা করিয়াছিলেন, মহম্মদ-বিন্-সাম কান্যকুব্জ অধিকার করিতে পারেন নাই। আমি এই কথা দেখাইয়া দিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে একথা স্বীকার করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশবর্ষীয় আক্‌বর অগণিত মোগলবাহিনীর সাহায্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা ও প্রশস্তি রচয়িতাগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু যে বীর বালক সপ্তদশবর্ষ বয়সে একাকী সমুদ্রোর্ম্মীর মতন মুসলমান-প্লাবনের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যাহার বাহুবলে জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর সপ্তবর্ষ পরেও কান্যকুব্জের প্রাচীন দুর্গশীর্ষে গাহডবাল-কেতন অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই হরিশ্চন্দ্রদেবের চিরস্মরণীয় নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। মুসলমানের ইতিহাসেও নাই, হিন্দুর ইতিহাসেও নাই। যোধপুরের রাঠোর রাজবংশ জয়চ্চন্দ্রের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া

থাকেন, তাঁহারাও অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রদেবের নাম অবগত ছিলেন না। মেবারের শিশোদীয় চারণকুল হাম্বির, জয়মল্ল, পত্তের বীরত্বের গাথা গাহিয়া থাকে;—রাঠোর চারণ যশোবন্ত ও দুর্গাদাসের গুণগান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারাও সপ্তদশবর্ষীয় বালক নরপতি হরিশ্চন্দ্রদেবের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা অবগত নহে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর মরণ নিকট হইয়াছিল। সেই জন্যই মুসলমানগণ দশ বৎসরের মধ্যে সিন্ধুতীর হইতে গৌড়ে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু যখন মরিতে বসিয়াছিল, তখনও তাহার বীরত্বের অভাব হয় নাই, নূতন আবিষ্কারের আলোকে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যখন চাহমান পরাজিত হইল, তখন গাহড়বাল হয় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, না হয় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; তখন পাল ও সেন, চন্দেল্ল ও শিশোদীয় দূরে দাঁড়াইয়া দর্শকের ন্যায় সকৌতুকে প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে গাহড়বালের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। জয়চ্চন্দ্রের পুত্র যখন কান্যকুব্জ রক্ষায় ব্যস্ত, তখন হীনবল পালেদেরও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সেন তখনও নির্ব্বিকার, অথবা গৃহবিবাদে ব্যাপৃত। যখন সেন মরিল, তখন আর দর্শক রহিল না। এই জন্যই উত্তরাপথের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এতদিনে ভারত-কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে, সত্য সত্যই অপনোদিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নাই, তাহা শুনিয়া উপভোগ করিবে কে?

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্গালীর উৎপত্তির বিশ্লেষণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাস হইতে ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার প্রতিপাদ্য বিষয় সাত ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ-সম্ভূত নহেন। "বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্য শোণিতের

এত প্রবল স্রোত বহে না।" তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যত্বাভিমানী বাঙ্গালাদেশে এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ দান করে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এদেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই, বা আর্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌণ্ড্রদিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহুপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা এদেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারস্য, এবং গ্রীস্ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌণ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন-সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু, শক, যবন, পহ্লব (কেহ লিখেন পহ্নব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পৌণ্ড্রদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-বিহীন অনার্য্যজাতির বাসস্থান ছিল।" ইহার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া বঙ্গে আর্য্যাধিকারের কাল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কেবল চেষ্টামাত্র। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" লিখিত হইয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন আশাই ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সুহৃদ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর্য্যাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গের অবস্থা নিরূপণের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত এবং হরপ্রসাদের নির্দ্দিষ্ট

পন্থাবলম্বনেই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয় নামক মৎ-প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-মণ্ডল বা বঙ্গদর্শন।

সুস্বপ্ন আবেশে অনন্ত আকাশে
দেখিলাম, ভানু, অনুচর লয়ে,
আলোক-লীলায় চলেছে কোথায়,
বিবিধ ছটায় উজলি আলয়ে;
রবির প্রভাসে গ্রহদল ভাসে,
আলোক লইয়া আলোক বিলায়;
সৌর কেন্দ্র ঘিরে কত দূরে ফেরে,
কত নব পথ আলোকিয়া ধায়;
সেথা দিবানিশি হাসে পূর্ণ শশী,
সেথা দিবাকর নাহি অস্ত যায়;
চির সমুজ্জল সেই গ্রহদল
চির সমুদিত সেই সবিতায়।

দেখিতে দেখিতে যেন আচম্বিতে
দেখি সে রবির ছবি সেথা নাই!

অরুণের সম অতি অনুপম
যেন তনু কার ভাতিছে সে ঠাঁই ;
শশীকর দিয়া যেন তা' গড়িয়া
রবির করে কে করায়েছে স্নান,
প্রখরতা নিয়া ছানিয়া ছানিয়া
কে যেন লাবণ্য করেছে নির্ম্মাণ ;
অঙ্গের সৌষ্ঠবে বর্ণের গৌরবে
যেন সে সরম দিবে দেবতায় ;
ললাটের তলে নয়ন-কমলে
আপনি প্রতিভা ফুটিবারে চায়।

দেখে চিনিলাম, সে যে অবিরাম
এ বঙ্গের মহাপুরুষ-প্রবর,
যাঁর কণ্ঠ হতে অমৃতের স্রোতে
বহিল নবীন ভাষার নিঝর ;
যাঁর কণ্ঠানিলে সাহিত্য-সলিলে
একটি বুদ্বুদ একদিন উঠি,'
অনন্ত তরঙ্গে আলোড়ি' এ বঙ্গে
সঞ্জীবন স্রোতে যাইতেছে ছুটি।

সৌর ক্ষেত্রে চাই, সৌর সখা নাই ;
প্রতি গ্রহে দেখি নবীন মূরতি ;
নবীন সৃজন, নবীন ভুবন,
নবীন ভাবের নবীন স্ফুরতি ;
সৌর সভাস্থলে নব নভোতলে
অভিনব সভা দেখি সমাবেশ ;
সে পুরুষবরে বসিয়াছে ঘিরে
প্রতিভার করে উজলিয়া দেশ ;

হেমচন্দ্র কবি— দেশপ্রেম ছবি—
গিরিস্রোত প্রায় ভাষায় প্রবল ;
পাশেতে নবীন, বহে অনুদিন
কাব্যক্ষেত্রে যেন প্রবাহ তরল ;
কাছে জ্ঞান জ্যেষ্ঠ সেই রাজকৃষ্ট—
অক্ষুব্ধ বিস্তার বিদ্যাবারিধির ;
সঙ্গে চন্দ্রনাথ, ভাবের প্রপাত
শাস্ত্র উৎস হ'তে ঝরে ঝির ঝির ;
চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমের'
উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ একদিকে ;
সুধী রামদাস দিতেছে আভাস
পুরাবৃত্ত পটে, অঙ্কে, অনিমিকে ;
সে ইন্দ্রনাথের রহস্য ভাণ্ডের
রস চারিদিকে উছলিয়া যায় ;
স্থির রসময় 'প্রাবু'র অক্ষয়
রসের সায়রে ডুবাইতে চায় ।

বুঝিলাম আজি সেই গ্রহরাজি
উঠেছে আবার স্মৃতির আকাশে,
সৌর বিশ্ব প্রায় আলোক ছটায়
একদিন যারা ফুটিল এ বাসে ;
বঙ্গভাষারূপ গগনের স্তূপ
আলোকিল যেই বিচিত্র মণ্ডল,
এযে সে ভাস্কর কোবিদ-নিকর—
বঙ্গদর্শনের সৌর সভাস্থল ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ।

আটচালা বা নাচঘর—দক্ষিণ দিক হইতে।

(বকুল বৃক্ষের নীচে একটী প্রকাণ্ড বেদী ধরিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। ঐ বেদীর উপর রাধাবল্লভকে মেলার সময় ফুলের সাজ করিয়া বসান হয়। বেদীটি আগে বাড়ির বাহিরে দক্ষিণ দিকে মেলার স্থানে ছিল। কিন্তু এখন ঐ স্থান রেলওয়ের অধিকারভুক্ত হওয়ায় বেদীটি ভাঙ্গিয়া বকুলতলায় নিয়া আসা হইয়াছে।)

BIJOYA PRESS

বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত

১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২।৭৩ খৃঃ অব্দে "বঙ্গদর্শন" সর্ব্বপ্রথম বাহির হয়। যে আজি বিয়াল্লিশ বৎসর হইল। তখন ইংরাজীওয়ালাদের ভিতর সংস্কৃত জানা লোক অতি অল্প ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ সংস্কৃত লইতেই চাহেন নাই। পরে কাউএল সাহেবের চেষ্টায় পরীক্ষায় সংস্কৃত লওয়া হইয়াছিল। সংস্কৃত পরীক্ষা ৫।৭ বৎসর মাত্র হইবার পর 'বঙ্গদর্শন' প্রথম বাহির হয়। তখন অতি অল্প লোকই উত্তরচরিত পড়িয়াছিল। কারণ এদেশের টোলে উত্তর-চরিতের চলন ছিল না। ও বইখানি উইলসন সাহেব বোম্বাই হইতে আনিয়াছিলেন। সংস্কৃত উত্তরচরিত যে অধিক লোকে পড়ে নাই ইহা বঙ্কিমবাবু পাকতঃ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন,—

"উত্তর চরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত, কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন।"

এতপূর্ব্বে এরূপ একখানি অপ্রচলিত নাটকের দোষগুণবিচার করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট সহৃদয়তা ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। সহৃদয়তা,—কেননা, নাটকখানি খুব ভাল, যাহার হৃদয় আছে সেই, এ নাটকের মর্ম্ম বুঝিতে পারে, অন্যে পারে না, পণ্ডিত মহাশয়েরা পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহারা ভবভূতিকে মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষের নীচে স্থান দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর হৃদয় ছিল, তিনি এ নাটকখানির মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহা স্বদেশবাসিগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসও প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ, তখন ইউরোপীয় ধরণে কাব্যপরীক্ষা এদেশে আরম্ভ হয় নাই। এদেশের

পণ্ডিতেরা 'সাহিত্যদর্পণ' 'কাব্যপ্রকাশ' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থের মত-অনুসারে কাব্যপরীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমবাবু সেমত একেবারে ত্যাগ করিয়া নূতন, ইউরোপেও নূতন, ধরণে উত্তর চরিত সমালোচনা করিতে বসিলেন।

সংস্কৃত উত্তরচরিত বঙ্কিমবাবুর যে ভাল করিয়া পড়া ছিল, বোধ হয় না। তিনি ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট যে সকল কাব্য পড়িয়াছিলেন উত্তর চরিত তাহার ভিতর ছিল না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, নৃসিংহবাবুর বাঙ্গালা ও টনি সাহেবের ইংরাজী তর্জ্জমা বাহির হওয়াতেই তিনি উত্তরচরিতের দোষগুণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, উত্তর চরিতের মত কাব্য বুঝিয়া লইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। তথাপি তিনি বলিয়াছেন "আমরা যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প।"

উত্তরচরিত পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আলঙ্কারিকগণকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উঁহারা যেভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান, সে ভাবে কাব্য নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি, অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কিনা, ইহা রূপক—কি উপরূপক, নাটক কি প্রকরণ, ব্যায়োগ কি ত্রোটক, ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি, এ সকল তত্ত্বের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত নহি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ, যে অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন। নচেৎ নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির

সৃষ্টির মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদের অনুবর্ত্তী হউন।” অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু এদেশে চলিত কাব্যপরীক্ষা একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের নূতন ধরণের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জয় জয়কার হইল। বাস্তবিকও একটা পুরাণ, পচা, একঘেয়ে সরুকাটা উপায় ত্যাগ না করিলে তখন কাব্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপায়ই ছিল না, এবং এইরূপে ত্যাগ করিতে বলায় বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশের যথেষ্ট উপকারও করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তিনি বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এই বিয়াল্লিশ বৎসরে সংস্কৃত অলঙ্কারের অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্কিমবাবু আধুনিক আলঙ্কারিককে যত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তত নিন্দার পাত্র নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যশাস্ত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া যথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমার এখন এই ধারণা হইয়াছে যে, নব্য আলঙ্কারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোট বড় গুণটি, দোষটি, অলঙ্কারটি ও রসটুকু থাকে, তাই দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত। প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু পারিতেন। তাঁহারা গল্পটি কিরূপে সাজাইতে হয়, সে সম্বন্ধেও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রস ও ভাব কিরূপে ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয়, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পিঁজিতে পটু “অ্যানালাইজ” করিতে খুব পটু। নূতন ধরণের যে পরীক্ষা অষ্টাদশ শতকে জর্ম্মানীতে আবির্ভূত হইয়া এখন সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের দেশেও আসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত। ছোটখাট দোষ গুণ অলঙ্কার রস তাঁহারা একেবারেই দেখিতে চাহেন না। তাঁহারা সমস্ত বইটা বেশ

করিয়া হজম করিয়া তাহা হইতে রস আকর্ষণ করিতে চাহেন। ইহাকে আমরা সমগ্রভাব বা "সিন্‌থেসিস্‌" বলিতে চাহি। এই দুই প্রকারের পরীক্ষায় না পাকিলে কাব্যের রসাস্বাদে অধিকারই হইতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। যদি সুধু দেশী প্রথায় চল, কেবল ছোট ছোট জিনিষ দেখিবে,—যদি সুধু ইউরোপীয় প্রথায় চল, কেবল বড় জিনিষ দেখিবে, ছোটর দিকে একেবারে দৃষ্টি থাকিবে না। সুতরাং এই দুইএর একত্র মিলনই সকলের চেয়ে ভাল। কিন্তু যখন একটার দিকে অধিক ঝোঁক দিয়া আর একটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হয়, তখন সেই লোপকরা জিনিষটার উপর ঝোঁক দিয়া যেটা চলিতেছে, তাহাকে লোপ করিবার চেষ্টা হয়। বঙ্কিমবাবুও ঠিক তাই করিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন পথ লোপ করিয়া নূতন পথ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সেটা দরকারই হইয়াছিল, নহিলে অলঙ্কারে ও দর্শনে কিছু তফাৎ থাকিত না এবং সে অলঙ্কারের হাতে পড়িয়া কাব্য একেবারে অতল জলে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে যে, আমরা দুই পথই দেখিব, ছোট জিনিষও দেখিব, বড় জিনিষও দেখিব। শব্দের পর শব্দ দিয়া যে গুণ হয় বা অলঙ্কার হয়, তাহাও দেখিব এবং ঘটনার পর ঘটনা পড়িয়া গল্পটি কি প্রকারে মনোহর হইয়া উঠে তাহাও দেখিব। তবে ত পূরা কাব্যখানায় রস আস্বাদন করিতে পারিব? এ দুয়ের কোনটিই ছাড়িবার যো নাই।

উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কে "চিত্রদর্শন।" বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে, যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্ব ঘটনা সকল বর্ণনা করেন। রামসীতার অলৌকিক অসীম ও প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।" আমরা বলি যদি চিত্রদর্শনটি প্রথম অঙ্কে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে বাধ্য হইতাম, যে উত্তরচরিত মহাবীর চরিতের শেষ অংশ মাত্র। মহাবীরচরিতে ভবভূতি বাল্মীকির গল্পটা অনেক জায়গায় ত্যাগ করিয়া নিজের মনগড়া করিয়া লইয়াছিলেন,

সেই মনগড়া গল্পের উপর মহাবীরচরিত হইতে পারিয়াছিল ; কিন্তু উত্তর-চরিত হইতে পারে না। তাই কবি বীরচরিতের গল্পটিকে পরিহার করিয়া আবার পুরাণ পথ অনেকটা ধরিলেন। যেন ভবভূতি মহাবীর-চরিতে বাল্মীকির পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছিলেন, চিত্রদর্শনে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং বাল্মীকির সঙ্গে কত-কটা মিট্‌মাট করিয়া লইলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন এটা উদ্দে-শ্যই নয়। আমরা ত দেখিতেছি এ একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এই চিত্রদর্শন ভবভূতি কোথায় পাইলেন ? সেটাও ত একটি দেখিবার কথা। সেটা দেখিতে পাইলে আমরা যে কেবলমাত্র উত্তরচরিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব তাহা নহে ; সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে পারিব এবং বুঝিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইব। ভবভূতি এটি কালিদাসের গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। ভবভূতি সংস্কৃতের শেষ কবি—ভাবের শেষ কবি—রসের শেষ কবি—প্রতিভার শেষ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু ভাল আছে, তিনি সব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাতে আরও রসান দিয়াছেন। রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গের পঁচিশ কবিতায় আছে যে, রাম ও সীতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিয়া নানাচিত্রশোভিত গৃহমধ্যে দণ্ডকারণ্যে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেই যে, চিত্রগুলি সে গুলি দণ্ডকারণ্যেরই চিত্র। সে চিত্রগুলি দেখিলেই পূর্ব্বের কথাগুলি মনে পড়িত এবং রাম ও সীতার তাহাতে আনন্দ হইত। তাই এখানে ভবভূতি সাহস করিয়া এই চিত্রগুলি আনিয়াছেন। ইহাতে শুধু দণ্ডকারণ্যের বৃত্তান্ত নহে রামচরিতের প্রথম হইতে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত ছবিই ছিল। ভবভূতি এই চিত্রদর্শন এত বাড়াইয়া তুলিলেন কেন ? কালি-দাসের ন্যায় শুধু দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার লইয়া থাকিলেই ত হইত। একটু বিশেষ কারণ আছে। রাম ও সীতার মনে আবার সেই বিরহ-ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার দরকার হইয়াছিল। তাই কবি বর্ষাকালে

মাল্যবান্ পর্ব্বতে রামের কান্নার ছবি দেখাইয়া চিত্রদর্শন এক প্রকার সাঙ্গ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ বলিলেন,

"সোঽয়ং শৈলঃ ককুভসুরভির্মাল্যবান্ নাম যস্মিন্
নীলঃ স্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতন স্তোয়বাহঃ॥"

অমনি রাম বলিয়া উঠিলেন,

"বৎসৈতস্মাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ॥"

চিত্র দেখিয়া রামেরি মনে হইতে লাগিল সীতার সহিত বিচ্ছেদ হইবে, তখন সে চিত্র দেখিয়া সীতার মনে কি ভাব হইল, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। রামসীতার মনে এইরূপ একটা বিরহের ত্রাস উৎপাদন করা চিত্রদর্শন প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য নয় কি? এ প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য বঙ্কিমবাবু ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রাম সীতার অলৌকিক অসীম প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কথাটা ঠিক, কিন্তু যে তিনটি বিশেষণ দিয়াছেন, তাহাতে কবির কথাটি ফোটে নাই। চিত্রদর্শনে ও সীতার নিদ্রায় কবি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাম ও সীতা গোড়ায় দুই থাকিলেও ক্রমে ক্রমে ক্রমে,—ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক হইয়া গিয়াছিলেন, রামের হাতে মাথা রাখিয়া সীতার নিদ্রা আর কিছু নহে, রামের সত্তায় সীতার সত্তা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাওয়া। যতক্ষণ চিত্র দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ উহাদের শরীর ও মন ক্রমে কাছে কাছে আসিতেছিল। নিদ্রাবেশে আরও কাছে, আরও কাছে, আরও কাছে আসিল; সীতা যখন ঘুমাইয়া পড়িলেন তখন রাম বলিলেন,—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তি র্নয়নয়ো—
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যস্তু বিরহঃ॥"

তখন সীতার স্পন্দ নাই। ইহারই একটু পরে সীতা স্বপ্ন দেখিয়া

কাঁদিয়া উঠিলেন "হা আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম সীতার ঘুম যাহাতে না ভাঙ্গে তাহা করিলেন, বলিলেন চিত্রদর্শনের জন্য ইঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইজন্য ইনি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহার পরই সীতার মুখের দিকে চাহিয়া রাম বলিলেনঃ—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥"

এরূপ সুমানুষের প্রেম অতিকষ্টেই পাওয়া যায়। এরূপ বোধ হয় একবারই হইয়াছিল। ইহা সুখে এবং দুঃখে অদ্বৈত। সকল অবস্থাতেই অনুকূল। এই প্রেমেই হৃদয়ের বিশ্রাম হয়। বৃদ্ধ হইলে ইহার রস শুষ্ক হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে যে আবরণ থাকে তাহা দূর হইয়া যায় এবং সে প্রেম স্নেহের সার হইয়া উঠে।

সীতার সত্তা ত নাইই, সেত রামে ডুবিয়াই গিয়াছে। তাহার উপর রাম বলিতেছেন "অদ্বৈতং", "একং" অর্থাৎ সীতা ও আমি একমেবাদ্বিতীয়ং। চিত্রদর্শন প্রস্তাবের এই যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য বঙ্কিমবাবু তাহা ধরিয়াছিলেন, কিন্তু বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফুটা-ইতে পারেন নাই। আমি ফুটাইবার কতকটা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফুটাইতে গেলে প্রবন্ধ তিনগুণ হইয়া পড়িবে, তাই এই-খানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এত কৌশলে ভবভূতি রাম ও সীতার প্রেমে সম্পূর্ণ অদ্বৈত ভাবটি দেখাইলেন, এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, জগৎকে দেখান যে, সীতার বনবাসে রাম যথার্থই আত্মবলি দিয়াছেন। যখন সীতা ও রামে কোন প্রভেদ নাই, তখন সীতার বিসর্জ্জনের অর্থ রামেরও আত্মবিসর্জ্জন। বঙ্কিম-বাবু ভবভূতির উপর বড় চটিয়াছেন, কারণ, তিনি রামকে কাঁদাইয়া-

ছেন। তিনি বলিয়াছেন "এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা,—শব্দের বড় ঘটা কিন্তু অন্তঃশূন্য—" "এইরূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য, কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কার-দিগের যোগ্য।" বঙ্কিমবাবু যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার যেরূপ প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সাহস করিয়া সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল উক্তি, তাঁহার সাহস ও প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যে রামচন্দ্র এই-মাত্র আপনাকে সীতার সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র সীতার বনবাসে নিজের যে সব নাশ হইল তাহাও বুঝিয়াছেন। সীতাকে, দুর্ম্মুখের মুখে নিন্দা শুনিবামাত্র, ত্যাগ করিতে তিনি স্থির সঙ্কল্প; এই যে ঝটপট একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা কি অসামান্য বীরের কর্ম্ম নহে? তিনি মন্ত্রসভা আহ্বান করিলেন না, মন্ত্রণা করিয়া সময়ক্ষেপ করিলেন না, একেবারে দুর্ম্মুখকে দিয়া লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, সীতাকে বিসর্জ্জন দাও। বঙ্কিমবাবু এ দিক হইতে একেবারে দেখেন নাই, তিনি কান্নাই দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই কান্নার ভিতর যে অমানুষ তেজ—অমানুষ বীরত্ব রহিয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি ভবভূতিকে পরীক্ষা করিতে গিয়া ভব-ভূতির অলৌকিক ক্ষমতার কথাটা ধরিতেই পারেন নাই। রামায়ণে রামচন্দ্র সভায় সীতার অপবাদের কথা শুনিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। হইলে তখনি তাঁহাকে লোকে কাপুরুষ বলিত। সেখান হইতে উঠিয়া ভাইদের ডাকাইলেন, মন্ত্রণা করিলেন, বলিলেন,—'সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইস' কিন্তু সীতার সহিত দেখা করিলেন না। সুতরাং তিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন, চোখের জল সামলাইতে পারি-লেন, মনের আগুন মনেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু ভবভূতির ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। চিত্রদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাম ভাবি-

আটচালা বা নাচঘর।
(পশ্চিম দিক হইতে)
৫১৫ পৃষ্ঠা।
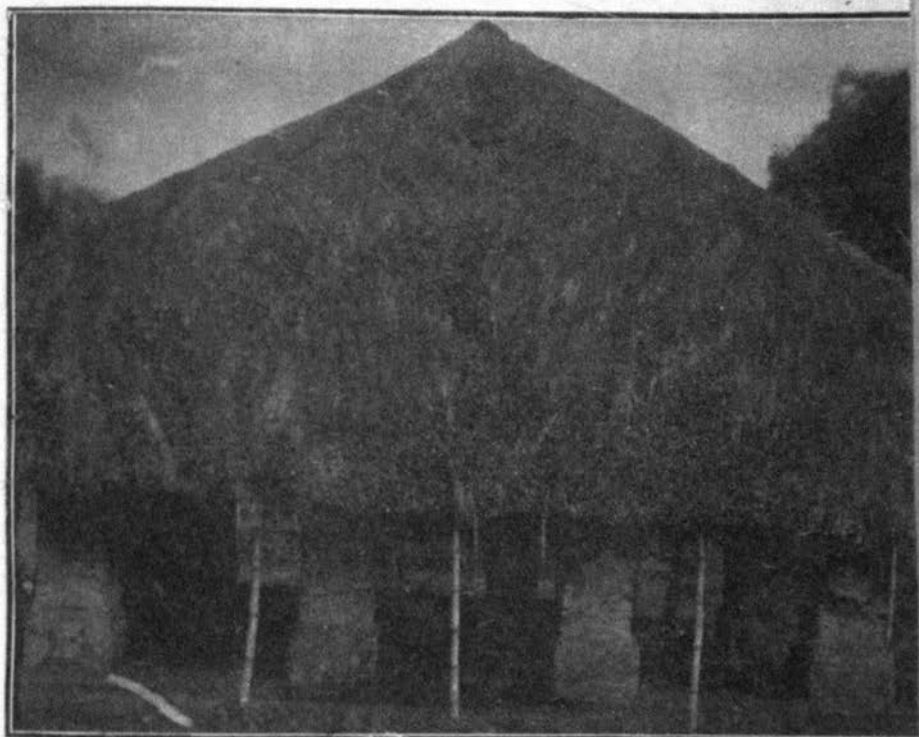
BIJOYA PRESS

য়াছেন সীতার কথা; সীতা ভাবিয়াছেন রামের কথা; ক্রমে সীতার সত্তা রামে ডুবিয়া গেল, রাম সীতাময় ও সীতা রামময় হইয়া উঠিলে ক্রমে দুইয়ে এক হইয়া গেলেন। তখনই দুর্ম্মুখ তাঁহাকে সীতার অপবাদের কথা বলিল। রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পরে উঠিয়া কাঁদিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জ্জন মীমাংসায় উপনীত হইতে ত তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না। লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি আত্মবলি দিলেন, তাহার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বলিব? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক, আমি ত পারিব না। আমি ত দেখি এ রাম রামায়ণের রামের অপেক্ষা, প্রেমেও বড়, বিরহেও বড়, বীরত্বেও বড়। তবে মানুষ ত? রক্ত মাংসের শরীর ত? এ অবস্থায় নির্জ্জনে বিশেষ সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায় না।

উত্তর চরিতের তৃতীয় অঙ্ক সব অঙ্কের চেয়ে ভাল। উহাতে রামকে পঞ্চবটী আনা হইয়াছে, যে পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র সীতার সহিত বনবাসে থাকিয়া দশ বৎসরকাল নির্ম্মল দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, বিধির বিপাকে আজ আবার রামচন্দ্র সেই পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইতেছেন। এখন সীতা নাই, সীতাকে রাম ইচ্ছাপূর্ব্বক বনবাস দিয়াছেন, সুতরাং তাহার কোন খোঁজও লইতে পারেন নাই। অথচ পঞ্চবটীর সর্ব্বত্রই সীতার স্মৃতি জাগরূক। এরূপ অবস্থায় রামকে কিরূপে সান্ত্বনা করা যায়। যদি কোন বিশেষরূপ সান্ত্বনার উপায় না করা যায়, তাহা হইলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, বা তাঁহার জীবননাশের সম্ভাবনা। পঞ্চবটীতে গোদাবরীর নিকট মুরলানদী গিয়া তাই বলিলেন,—রামচন্দ্র যখনই মূর্চ্ছিত হইবেন, তুমি ঠাণ্ডা হাওয়া করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা দূর করিও। গোদাবরী বলিলেন,—রামকে সান্ত্বনা করিবার একটি ভাল উপায় উপস্থিত হইয়াছে, ভগবতী

ভাগীরথীর কথায় সীতা নিজেই ফুল তুলিতে পঞ্চবটী আসিয়াছেন, আজ তাঁহার ছেলেদের জন্মতিথি পূজা। সীতার সঙ্গে তমসানদী আছেন। ভগবতী ভাগীরথী তাঁহাদের দুজনকেই অদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সকলকেই দেখিতে পাইবেন, অথচ তাঁহাদের কেহই দেখিতে পাইবেন না। বলিতে বলিতে গোদাবরীর হ্রদ হইতে সীতা উঠিতে লাগিলেন, এমন সময় নেপথ্যে শব্দ হইল "প্রমাদঃ প্রমাদঃ।" কে একজন বলিয়া গেল, সীতা যে হাতীর ছানাটিকে নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিলেন, আর একটা দুষ্ট হাতী আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, কে এখন ইহাকে রক্ষা করিবে? শুনিয়াই সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র আমার বালককে রক্ষা কর"। এ যে পঞ্চবটী, পঞ্চবটীতে তাঁহার যেমন অভ্যাস ছিল, তেমনি বলিয়া ফেলিলেন; তাহার পরই যখন সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল তখন তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহার যাহাতে চেতনা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে রামের রথ আসিয়া পৌঁছিল। রাম বলিলেন, "বিমানরাজ অত্রৈব স্থীয়তাম্"। সে স্বর সীতার কানে ঢুকিবামাত্র তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া তমসা তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কি একটা স্বর শুনিয়া তুমি এমন বিহ্বল হইয়া গেলে?" সীতা বলিলেন, "না তমসা, এ স্বর আমার চিরপরিচিত। ইহা আমার আর্য্যপুত্রের স্বর, ইহাতে আমার কান ভরিয়া গিয়াছে।" ক্রমে বনদেবতা বাসন্তী আসিয়া রামের কাছে জুটিলেন। সীতার কাছে ত তমসা আছেনই। সীতা শোকে অভিভূত হইলে তমসা তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন; কেননা তিনি নদী, তিনি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা করাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু ওদিকে রামচন্দ্র বেশী শোকে অভিভূত হইলে বনদেবতা বাসন্তী তাঁহাকে পুরাণ কথা স্মরণ করাইয়া আরও উত্তেজিত করিয়া তুলেন, কারণ তিনি বনদেবতা তাঁর সহৃদয়তা বড় কম। তাঁহাকে একটু নিষ্ঠুর বলিলেও বলা যায়, যেহেতু তিনি বনের দেবতা। রাম মূর্চ্ছিত

হইলে তমসার পরামর্শে সীতা আসিয়া রামকে স্পর্শ করেন, তাহাতে রামের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি সীতার হাত ধরিবার চেষ্টা করেন, একবার ধরিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু তিনি সে হাত রাখিতে পারেন নাই। এই যে সীতা,—অদৃশ্য সীতা—ছায়া সীতা—ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিষটা একটু লম্বা হইয়াছে। যতটুকু হইলে মানাইত তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ভূদেববাবু বলিয়াছেন যে, ও ছায়া-সীতা রামের কল্পনা মাত্র। "হ্যালিউসিনেশন" মাত্র। কেননা রাম যখনই থামেন তখনই সীতা কথা কন, অর্থাৎ রাম সুখে থাকিলে তাঁহার হৃদয় হইতে ঐ সকল কথা বাহির হয়। এই 'হ্যালিউসিনেশন' বুঝাইবার জন্য ভূদেববাবু তেষট্টি পাতা লিখিয়াছেন, অনেক গুণপনা দেখাইয়াছেন, অনেক গভীর কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু জিনিষটি খোলে নাই। তাঁহার তেষট্টি পাতা পড়িয়াও কাহারও বিশ্বাস হয় নাই যে এটি সত্য সত্যই রামের বিপ্রলম্ভ বা "হ্যালিউসিনেশন"। বঙ্কিমবাবু বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন নাই। ভূদেববাবুর কথায় প্রতীতি হইল না। তবে এ ছায়া সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব? এক উপায়—সেই উপায়—সংস্কৃত সাহিত্য-সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়াসীতা আনিয়াছেন, এবার বেশী-দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়াসীতার মূল পাওয়া যাইবে। কৌশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুষ্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারম্বার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে রাজা যে, পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এত বেশ সাজানই আছে! আমি কেন তিরস্করণী-

আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন। এ সৃষ্টিতে মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লোকই নাই। তথাপি বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, ভবভূতির সৃষ্টি ক্ষমতা তত উচ্চদরের নহে। একবিষয়ে বঙ্কিমবাবু ভবভূতিকে খুব উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার কথাই উদ্ধার করিতেছি,—

"রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন রস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উচ্ছ্বলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে—দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে, মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে, দেখিতে পাই, সীতা কখনও বিস্ময়স্তিমিতা, কখনও আনন্দোত্থিতা, কখনও প্রেমাভিভূতা, কখনও অভিমানকুণ্ঠিতা, কখনও আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা, কখনও অনুতাপবিবশা, কখনও মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—"গীতার" কথা

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—যেদিন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখন বঙ্কিমবাবু ডেপুটিগিরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুয্যির লেনস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও দুই তিনবার প্রকাশ্য সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাহা দূর হইতে; আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম—'ছিলাম' কেন বলি, এখনও আছি। যখন স্কুলে পড়ি, সে অবস্থাতেই ভক্তির পূর্ব্বরাগে হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। অতএব প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্ভ্রম মিশ্রিত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমার তখনকার অবস্থা সেক্‌স্পীয়র অমর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন;—

> Thus, Indian like
> * * I adore
> The sun, that looks upon his worshipper
> But knows of him no more.

এইভাবে কত বৎসর কাটিয়াছিল, ইতিমধ্যে আমি কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় প্রবিষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম; এমন সময় ভাগ্যদেবী একদিন আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপনীত করাইলেন।

উপলক্ষ্যটা বলি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলাম। লিওটার্ড নামে একজন আধা ইংরেজ আধা ফরাসী সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব ও আমার স্বর্গগত বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। আমিও একজন ছোটখাট পাণ্ডা ছিলাম। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম ছিল—The Bengal Academy of Literature। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবু যাহাতে এই সভার সহিত সংযুক্ত হন, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সম্মতিসংগ্রহরূপ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাই কোন এক অপরাহ্নে আমি বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন 'যৌবনে যোগিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনিই ছিলেন প্রধান দূত—আমি সহকারী মাত্র।

গোপালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত—কতকটা স্নেহপাত্রও ছিলেন। তিনি তখন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলি সংগ্রহ ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন—বঙ্কিমবাবু ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই উপদূতের কার্য্য করিতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত আমি 'সাহিত্যিক' বলিয়া পরিচিত হই নাই, যদিও তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি 'সাহিত্যে' ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কারণ, আমার স্মরণ আছে ইহার কিছুদিন পরে কোন বিজ্ঞ সমালোচক নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবজাত শিশু' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইয়া আমরা যথারীতি সংবাদ দেওয়ার পর তাঁহার দ্বিতল কক্ষে নীত হইলাম। আমি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোপালবাবু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্মিতমুখে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া

বসিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, 'সাহিত্যে' আপনার যে 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি"। বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিশেষ সম্মান বোধ করিলাম। আমি বলিলাম, "মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সব আপনি পড়েন নাই।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, "হাঁ অনেকই দেখিতে হয় বই কি! কোথায় কোন নূতন লেখকের উদয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করি।" প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন যে, আমি শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্র ওকালতীতে প্রবিষ্ট হইব, তাহাতে তিনি কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে হারাইব।" আমি নির্ব্বন্ধ করিয়া বলিলাম যে, "তাহা কেন? আমি সাহিত্য চর্চ্চা কিছুতেই ছাড়িব না।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ যে উকিলের সাহিত্য-চর্চ্চারূপ দুর্ণাম রটে, মক্কেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।" বলাবাহুল্য, বঙ্কিমবাবুর উপদেশে আমি তখন মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমি কায়ক্লেশে উভয়কুলই বজায় রাখিয়াছি।

এইবার গোপালবাবু নানারূপ ভূমিকা করিয়া আমাদিগের দৌত্য পেশ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কথার আবরণ ভেদ করিয়া, আরম্ভেই আমাদের দৌত্য নামঞ্জুর করিলেন এবং সাহিত্য পরিষদ্ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেববাবু জীবিত রহিয়াছেন, তখন আর কেহই Bengal Academy of Literatureএর সভাপতি হইতে পারেন না। সভার কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে এবং সভার কিছু সফলতা দেখিলে তিনি সভায় যোগদান করিবেন কিনা স্থির করিবেন। আমাদের দৌত্য এখানেই শেষ হইল। কিন্তু

প্রতিগমনের পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ চরিত্রে" নহে, তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। আমিও তখন গীতার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবুর কথা নিঃসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে পরে আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে। গীতার মর্ম্মান্তিক ঘটনা অর্জ্জুনের মোহ। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইলে বিপক্ষ পক্ষে আত্মীয়স্বজন অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনের চিত্তমোহ উপস্থিত হয় এবং তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে উদ্যত হইয়া করুণ স্বরে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তিনি আরও বলেন যে, বরং কৌরবেরা তাঁহাকে নিশিত শরে নিহত করুক, তিনি তাহাদের অঙ্গে অস্ত্রপাত করিবেন না।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ন মানসঃ॥

অর্থাৎ এই বলিয়া অর্জ্জুন রণস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া

বৈঠকখানার বড় হল।

এইঘরে একটী ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত এবং কোণের জানালার নিকটে যে স্থানে একখানা ছাতা রহিয়াছে, তথায় একটী হারমনিয়ম থাকিত। বঙ্কিমবাবু সময় সময় এই হারমনিয়মে সঙ্গীতাভ্যাস করিতেন।

৫১৬ পৃষ্ঠা।

বিজয়া প্রেস, কলিকাতা।

শোকাকুলচিত্তে রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইহারই নাম অর্জ্জুনের মোহ। গীতা ইহার নাম দিয়াছেন "কশ্মল"।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।"

এই কশ্মল হইতেই গীতার আরম্ভ। অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে মৌখিক উপদেশে সে মোহ তিরোহিত হইল না, তখন তিনি আপনার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিলেন। এই বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতার একাদশ অধ্যায় নিযুক্ত। সেই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের মোহ তিরোহিত হইল। তাহার পর তিনি বলিলেন:—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

"আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

আমার বিশ্বাস, গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার মুখ্য ঘটনা ছিল। মহাভারতের আদি পর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে ইহা সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের সারসংগ্রহ। এই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের একটি শ্লোক এই:—

যদা শ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদানাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে, "যখন শুনিলাম যে, অর্জ্জুন 'কশ্মল'-গ্রস্ত হইয়া 'রথোপস্থে' অবসন্ন হইয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দর্শন করাইয়াছেন তখন আর জয়ের আশা করিতে পারি না।"

ভগবদ্গীতার বক্তা সঞ্জয়ও বলিতেছেন যে, ব্যাসের প্রসাদে তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥

"শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণে আসিতেছে এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষ অনুভব করিতেছি।"

এখানেও বিশ্বরূপ দর্শনের কথা। এই বিশ্বরূপ দর্শনে যাহার মোহ দূর না হয়, তাহাকে সাংখ্যের ত্রিগুণ-তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব বঙ্কিম-বাবু যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতেন, ইহা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায়—যাহাতে ভক্তের ও ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে এবং যাহাকে বঙ্কিমবাবু গীতার মৌলিক অংশ বিবেচনা করিতেন এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তি-বাদ জগতে আর কোথাও নাই। সেইজন্য ভগবদ্গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।"—সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের কি গতি হইবে? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায়েও এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহার ধ্বনি মূল গীতার ধ্বনির অনুরূপ। * আমার মনে হয়, এ সমস্যার পূরণ এই যে, মূল ভগবদ্গীতা (যাহার প্রতি

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২২—২৬ শ্লোক; ১৫ অধ্যায়ের ৫—৮, ও ১২—১৮ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তাহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান (arrangement) অন্যরূপ ছিল। গীতার বর্ত্তমান আকারে পুনঃ সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর এ কথা ঠিক যে, বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি।

বঙ্কিমবাবুর কথা বলিতে গিয়া গীতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বসিলাম। কিন্তু ঐদিন বঙ্কিমবাবু গীতার শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গীতার পাঠক ও সমালোচকবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্ত্তীকালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্কিম-স্মৃতি

সে সেদিনকার কথা বলিয়া মনে হইলেও দেখিতে দেখিতে চল্লিশ বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে। যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্ব প্রথম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তখন আমার বয়স ষোল সতের বৎসর হইবে। আমাদের গ্রামে ভট্টাচার্য্য পল্লীর কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহের মকদ্দমা। ভিন্ন জাতীয় এক কন্যার সঙ্গে ঐ ভট্টাচার্য্যবংশীয় কালীনাথের বিবাহের ঘটক ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে জাতি ও ধর্ম্মনাশের মকদ্দমা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারাসতের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ে উপর্য্যুক্ত ঘটনা-সংস্পৃষ্ট আসামীদের বিচার হয়। আমরা গ্রামের বহুসংখ্যক বালক সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম।

বারাসতের আদালতগৃহ উদ্যান-পরিবেষ্টিত এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারাসত জেলা ছিল এবং মহকুমায় পরিণত হওয়ার সময়ে দেশবিশ্রুত স্যর আস্‌লি ইডেন সাহেব এখানকার প্রথম মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বহু বহু প্রধান ব্যক্তির পদার্পণে সেকালে বারাসত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্যারিচরণ সরকার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এখানে জেলা স্কুলের শিক্ষক। কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র সহোদরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিসূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সর্ব্বদাই তাঁহাদের সঙ্গ-সুখ সম্ভোগের লোভে বারাসতে যাতায়াত করিতেন। সেকালে সমগ্র বঙ্গের মধ্যে বারাসত কলিকাতার নিকটে একটি প্রধান স্থান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বহু বহু সাধুজনের পদরজস্পর্শে পূত-তীর্থস্থানে বিচারাসনে যখন উপবিষ্ট, তখনই তাঁহার সেই সর্ব্বজন-লোভনীয় সৌন্দর্য্যের লীলা-বিলাস সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদা ঋষিরা রামরূপে মুগ্ধ হইয়া রামের পুরুষকান্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি সে-

দিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়া সেই যে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্যের তেমন বিজলী-লীলা আর কখন কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য্য ও চুঁচুড়ার ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি, তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। জনসমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্য্যরাশিও বিরল বটে, তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথও সুপুরুষ, কিন্তু যেন মনে হয় মেয়েলী ঢংএর রূপরাশি তাঁর চারিদিক আলো করে। কিন্তু বঙ্কিমের সে সিংহ-বিক্রম-বিমণ্ডিত পৌরুষভাবময় সৌন্দর্য্য আর কোথাও ডেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে রূপের দেমাক্ বড়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভয়ানক ডেমা'কে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই, সে অহঙ্কারের কিয়দংশ বোধ হয় তাঁহার পুরুষোচিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহের অহঙ্কার। 'বোধ হয়'—বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উত্তর কালে তাঁহার নিকট (অস্মদীয় সাহায্য ব্যতিরেকে) পরিচিত হওয়ার সময়ে বা তৎপরে কখনও অহঙ্কারের পরিচয় পাই নাই। সর্ব্বদা সরল লোকের ন্যায় সহজ ব্যবহারই করিতেন। হইতে পারে হয় ত বা আমি তাঁহার অহঙ্কার প্রদর্শনের যোগ্যপাত্র ছিলাম না।

দেখিতে গিয়াছিলাম বিবাহবিচার, কিন্তু সে সব ভুলিয়া দেখিয়াছিলাম—নয়ন ভরিয়া, পরমানন্দে দেখিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবুকে। আমার দ্বিগুণ বয়সের বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর আমি তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সের বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাঠক হয় ত বলিবেন, আমি খুব রসজ্ঞ বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না, কারণ বৎসরেক বয়স্ক বালকও ফুলের শোভায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমিও তেম্নি বঙ্কিম-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন আদালতে বহু উকিল মোক্তার উপস্থিত ছিলেন, পক্ষাপক্ষ আমলা ও অসংখ্য দর্শকে আদালতগৃহ পূর্ণ হইয়া-

ছিল; সেই জনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাজাসনে উপবিষ্ট রাজযোগ্য শোভামণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া একটি রূপবান পুরুষ, অথবা স্বর্গচ্যুত বিদ্যাধর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিনকার সে স্মৃতি আজিও নয়নে লাগিয়া আছে।

প্রথম পরিচয়ের দিন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নবীন বয়সের সে লাবণ্য-লীলার উল্লেখ করিয়া যখন বলিলাম, "আমার জন্মস্থান নলকুঁড়াগ্রামের কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক মকদ্দমা উপলক্ষ্যে বারাসতের আদালতগৃহে বিচারাসনে উপবিষ্ট আপনাতে, আর এই প্রবীণ ও পরিণত বয়সের আপনাতে কত প্রভেদ! আপনার সে বাব্‌রিকাটা রুক্ষ অথচ ঘনকৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি-পরিশোভিত মুখ যে দেখিয়াছে, সে আজ আপনাকে দেখিয়া সেই বঙ্কিমবাবু বলিয়া কখনই চিনিতে পারিবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি আমাকে বারাসতে দেখিয়াছিলেন? হাঁা হাঁা এক বামুনের ছেলের বিবাহবিভ্রাটের মাম্‌লা আমার স্মরণ হইতেছে। সেইদিন দেখেছিলেন? সে আজ কতদিনের কথা, আর এ শরীরের উপর দিয়া কতশত প্রকারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচারও হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। বেঁচে আছি, সময়ে সময়ে ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।" আমি যেই বলিলাম, "সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘজীবন যাপনের উপযোগী আয়োজনের ত অভাব ছিল না, তবে কেন এমন হইল?" উত্তরে বলিলেন, "কতগুলি অত্যাচার শুনিবেন? প্রথম চাক্‌রির চাপ, চাক্‌রিতে মানুষ আধমরা হয়। তার উপর নিজের সখ—কিছু লেখাপড়ার রোগ ছিল। বঙ্গদর্শনের জন্য কত রাত্রি যে জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। ঘাড়ে ভূত চাপার মত, আমার বিশ্রামসুখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর মনকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিবারাত্রি খাটাইয়াছে, ইহার উপর অন্য নানা প্রকারেও শরীরের উপর অত্যাচার হইয়াছে। এখন এ বয়সে আর সাম্‌লাইবার উপায় নাই।" বঙ্কিমবাবুর এই অকপটতা আমার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিল। দেখেছি অনেক

লোক, অনেক বড় লোকও, অনেক সময়ে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অমরপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের অকপটতা আমার নিকট ঋষি-জনোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তারপর বলিলেন, "দেখুন, আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু কাজ করিতে বড় সাধ, কিন্তু দেহের অবস্থা সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। মানসিক পরিশ্রমেই মানুষ অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শরীর মন উভয়ের শ্রমের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে হয় ত এখনও আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, কিন্তু এ বয়সের উপযোগী শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্র কোথায়?" শেষে গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দু'চারিটি কর্ম্মীর নাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "এঁদেরমত স্যর রমেশচন্দ্র প্রভৃতি আমরা কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া নানাবিধ শ্রমকর ক্রীড়াকৌতুকে অপরাহ্ন-কাল গড়ের মাঠে কাটাইতে পারিলে, বোধ হয় শরীরে কিঞ্চিৎ শান্তি ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারিত। কিন্তু এ বয়সে 'শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা'র মত ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও লজ্জাবোধ হয়। আর সহরের লোক, বিশেষতঃ কলেজের ছেলেরা, বুড়োদের খেলা নিয়ে কত তামাসা করিবে, সেটা বড়ই মুস্কিলের কথা।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার কত কথাই আজ স্মরণ হইতেছে। সেগুলি গুছাইয়া লিখিতে হইলে, নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহারই কথা আলোচনা করিতে গেলে, অনেক কথার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, অথচ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলিয়া নিজের কথাও প্রবন্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সম্মত নহি। তাই আজ অনেক কথা হাতে রাখিয়া কেবলমাত্র আর দু'তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবসন্ন কলেবরে শক্তিসঞ্চারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বক্তৃতা

করিয়াছিলেন, সে সকলের কয়েকটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আল্‌বার্ট্‌ হলে আহূত সভা সকলের কয়েকটিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হওয়ার পর, আর তাঁকে দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয় দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, কোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।"

এখানে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয় বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের সুর বাঁধিয়া লোকের নাচানাচির মাথায় মুগুর মারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কিরূপ ধর্ম্মের সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহা পাওয়া যায়। অতি পরিষ্কার ভাবেই তিনি "প্রচারে" সে কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটি মাত্র ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কুল-মর্য্যাদা-সম্পন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত

ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সমাজ-ধর্ম্মের আদর্শ কত উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল। অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ধর্ম্মতত্বে কেশবচন্দ্রের নামটি উঠাইয়া দিয়া তাঁহার ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। হায় রে দেশ!

মোগলকুলতিলক আক্‌বর সাহকে আমরা সম্রাটশিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আক্‌বরের বিবিধ গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল-রাজদরবারকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্বিলীর হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছেন। সভা সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশী অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মিলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগতপ্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম স্মরণ নাই, তবে তাতে প্রসঙ্গ-ক্রমে মোগল শাসনের উল্লেখ ছিল এবং আক্‌বরের প্রসঙ্গও ছিল।

সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল, একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুক্কায়িত সত্যকথা প্রকাশ পাইল। তিনি সে-দিন বলিয়াছিলেন, "আক্‌বরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার উচ্চ উদার রাজ-নীতিজ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে মোগল অন্তঃ-পুরে গ্রহণ করিয়াছেন এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতার লেশমাত্রও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের

পরিণয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও না হয় একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আক্‌বর স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র।"

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি কাল আমায় খুব বাঁচাইয়াছেন। এত লোকের জনতা হবে জান্‌লে কি আমি যেতুম্। আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়্‌বেন। পরে আমি দু'দশ কথায় আমার মন্তব্য শেষ করিব। একি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়?" এই "ঐ রকম" কথার অর্থ এই যে, সে দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্বিলীর স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহুলোক অতিকষ্টে কেবল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুক্ষভাবে, পরে অভদ্রোচিত ইতর বচন-বিন্যাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য-দর্শন আর কখন ঘটিয়াছিল কি না জানি না। বঙ্কিমবাবুর ত নিশ্চয়ই ঘটে নাই। সেই গোলটা থামাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হই-বার চেষ্টায় ছিলাম, ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চরিত-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র

১।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিতে বসিয়া আজ নব-পর্য্যায় বঙ্গ-দর্শনের শেষ সম্পাদক প্রিয়সুহৃৎ শৈলেশচন্দ্রের কথা বারবার মনে পড়িতেছে। এক বৎসর হয় নাই, শৈলেশচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। বহুদিন হইতেই তাঁর এই সাধ ছিল। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র প্রকাশিত হইবার পরেই, দু'চারিজন প্রাচীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিম-চন্দ্রের একখানি চরিতালেখ্য লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। শৈলেশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে ইতিপূর্ব্বেই আমাকে এ কাজে হাত দিতে হইত। আজ শৈলেশচন্দ্র এলোকে নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই আমি তাঁর সাধের বঙ্কিম-চরিত-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিজের সাধ এবং অপরের অনুরোধ সত্বেও এতাবৎকাল বঙ্কিমের চরিতালেখ্য রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; কারণ, সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই। ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় না থাকিলে, কাহারও যথাযথ চরিতালেখ্য অঙ্কন করা সহজ নয়; সম্ভব কিনা তাহাই অনেক সময় সন্দেহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দু'চারবার সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু সে সামান্য পরিচয়ে মানুষকে চিনা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমকে বাঙ্গালাদেশের কে না জানে? বাল্য অতি-ক্রম করিতে না করিতেই, তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আমারও পরিচয় আরম্ভ হয়। যে বয়সে আমাদের দেশে, পুত্র পিতার মিত্র হইয়া থাকে, সেই বয়সেই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে বঙ্কিমের মানস-সৃষ্টি সকলের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। বুঝিতাম না, কিন্তু পড়ি-তাম। অথবা বুঝিতাম নাই বা বলি কেমনে? আপনার অধিকার

অনুযায়ী যাহা পড়িতাম, তাহা বুঝিতাম বই কি? না বুঝিলে তাহাতে এমন রস পাইতাম না। আর দুর্গেশনন্দিনী কি কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী বা চন্দ্রশেখর, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের সভা কিম্বা উত্তররাম-চরিতের সমালোচনা, এগুলি ত স্কুল কালেজের পাঠ্য ছিল না যে বুঝি আর না বুঝি, রস পাই আর না পাই, ষ্টেটিক্‌সের থার্ড সিষ্টেম অব্ পুলির (Third System of Pulley'র) মতন, "রোগী করত বৈসে ঔষধ পান," তেম্নি করিয়া গলাধঃকরণ করিতেই হইত। স্কুলের বই ছাড়িয়া বঙ্কিমের লেখা পড়িতাম। কালেজে আসিয়া,—তখন প্রেসিডেন্সী কালেজের এখনকার ঐশ্বর্য্যও ছিল না বন্ধনও ছিল না,—চারিদিকে খোলা মাঠ, আর মাঠের পরেই রাজপথের পরপারে যোগেশচন্দ্রের ক্যানিং লাইব্রেরী—কালেজ হইতে পালাইয়া, রাজকৃষ্ণবাবু ও হাও সাহেবকে ফাঁকি দিয়া, যোগেশবাবুর কৃপায়, তাঁর দোকানে বসিয়া, দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রসসৃষ্টি প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতাম। রসবস্তু কি, তখন ইহা জানিতাম না। সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবার পাণ্ডিত্য এখনও জন্মায় নাই, তখন ত ছিলই না। তবে রস-পিয়াসাটা প্রবলই ছিল। আর রসের জ্ঞান না থাকিলেও, সহজ রসানুভূতির শক্তিটা বিধাতা যেমন দিয়াছিলেন, সেইরূপই ছিল; মানুষের শিক্ষার তাড়নায় তখনও তার বিচক্ষণতা জন্মায় নাই। যাহা ভাল লাগিত, তাহাকেই ভাল বলিতাম। যাহা ভাল লাগিত না, তাহাকেই মন্দ ভাবিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আর কি দোষগুণ আছে, জানি নাই, বুঝি নাই; কিন্তু বড় মিষ্ট লাগিত, এ কথাটা এখনও মনে আছে। আর মিষ্ট লাগিত বলিয়াই সেগুলি খুবই পড়িতাম। যখন যেটি প্রকাশিত হইত, তখনই সেটি পড়িয়াছি। সে-পড়ার প্রভাব মন হইতে আজি পর্য্যন্ত ধুইয়া যায় নাই।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যিক-চরিত্র

এরূপ ভাবে, বাঙ্গালাদেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ

লোকের মতন, আমিও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে আযৌবনই জানিয়াছি। কিন্তু এ ত তাঁর বাহিরের দিক ; তাঁর সত্তার দিক নয়, তাঁর প্রকাশের দিক্‌মাত্র। এ সকল তাঁর রূপ, স্বরূপ ত নয়। রূপের অন্তরালে স্বরূপটি সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকে, সত্য। কিন্তু রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপে যাওয়া যায় না। প্রকাশের ভিতরে বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায়। রূপের মধ্যে স্বরূপের তটস্থ লক্ষণ মাত্র প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিকে দেখিয়া স্রষ্টাকে যতটুকু জানা যাইতে পারে, সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও সাহিত্যিককে ততটুকুই জানা সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার সত্যজ্ঞানলাভ অসম্ভব। এ জ্ঞান পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়। ইহা অল্পবিস্তর অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে। অনুমিত-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় না ; প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অনুমান সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। অনুমানের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। এইজন্য কেবল তাঁর গ্রন্থাদি পড়িয়া সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্বল্পাধিক মনগড়া ছবি আঁকা সম্ভব হইলেও, সত্যকার মানুষটি যে তিনি কেমন ছিলেন, তার প্রতিকৃতি পরিস্ফুট করা সহজ ত নয়ই, সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। এই মানুষটিকে ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। খালি গায়ে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। খোলা প্রাণে কথাবার্ত্তা কহিতে কখনও শুনি নাই। সুখেতে তিনি কতটা বিহ্বল, দুঃখেতে কতটা অবসন্ন হইতেন ; প্রাপ্তিতে তাঁর কতটা আনন্দ, অপ্রাপ্তিতে কতটা বিষাদ হইত ; প্রশংসায় কতটা কাঁপিয়া উঠিতেন, স্তুতিবাদে কতটা গলিয়া পড়িতেন, আবার অপ্রশংসায় ও নিন্দাতে কতটা উষ্ম বা উত্তেজিত হইতেন ; সংসারের বহুবিধ সম্বন্ধেতে তিনি কখন্ কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন ;—এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া না দেখিলে, মানুষটি যে কেমন ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া ধরা সম্ভব

নয়। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই কেবল একটু আধটু চিনে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনে না। অথচ সেটিকে না চিনিলে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির নিগূঢ় এবং যথার্থ মর্ম্মও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এইজন্যই সাহিত্য সমালোচনায়, সাহিত্যিকের খাঁটি চরিত্রটি যথাসম্ভব জানা ও ধরা এত আবশ্যক।

এই ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ কত অগণ্য যুগ হইতে তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া, তাঁহাকে বুঝিতে ও জানিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কিছু জানিয়াছে কি? স্রষ্টাতে আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ আরোপ করিয়া তাঁহার স্তুতিবন্দনা করি, সৃষ্টিকার্য্যের আলোচনাতে তার পরিতোষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? আমাদের প্রাচীন লোকায়তগণ, ইউরোপের আধুনিক যুক্তিবাদী ও জড়বাদিগণ—সকলেই এপথে যাইয়া, কেহবা প্রকাশ্য আর কেহবা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যে পৌঁছিয়াছেন। স্রষ্টাকে দয়াময় বল; সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রামের শোণিত-প্রবাহে দয়ার চিহ্ন কোথায়? স্রষ্টাকে মঙ্গলময় বল, রোগশোক-পাপতাপ-জর্জ্জরিত সংসারে মঙ্গলই বা কৈ? এই পথে ঈশ্বরজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে যাইয়াই ইংরাজ মনীষী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্—জগৎস্রষ্টা সর্ব্বমঙ্গলময় হইলে, সর্ব্বশক্তিমান নহেন, কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন,—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। সৃষ্টির ভিতরে তার সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, তার সকল সমস্যার মীমাংসা, তার সকল সত্তার বা ক্রিয়ার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা না করিয়া, আত্মজ্ঞানের দ্বারা, অপরোক্ষানুভূতিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে পরে, সেই স্বরূপের সাহায্যে এই বিচিত্র বিশ্বরূপের মর্ম্মোদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইলেই কেবল সৃষ্টির সত্য অর্থ বুঝা সম্ভব হয়। সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টাকে সত্যভাবে জানা যায় না। স্রষ্টার ভিতর দিয়া, তাঁর সৃষ্টিকে যিনি দেখিতে পারেন, কেবল তিনিই সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের যথার্থ তত্ত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন।

জগৎস্রষ্টাকে যেমন করিয়া জানিতে হয়, সাহিত্যস্রষ্টাকেও সেইরূপ করিয়াই জানিতে হয়। আগে মানুষটিকে জানি, চিনি, বুঝি; তার পরে তিনি কি ভাবে কি করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কি বলিতে চাহিয়াছেন, আর কতটাই বা তাহা বলিতে পারিয়াছেন, কোথায় তিনি পরিপূর্ণ সফলতা, কোথায় আংশিক সফলতা, আর কোথাই বা একান্ত নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছেন; ইহা ধরিতে, বুঝিতে, এবং প্রমাণপ্রয়োগে অপরকে বুঝাইতে পারা যাইবে। ইহাই সাহিত্য-স্রষ্টার চরিতালেখ্য রচনার মুখ্য প্রয়োজন।

সাহিত্য ও জীবন।

স্রষ্টাকে না জানিলে, তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ ও সকল রসভোগ সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল রহস্য-ভেদ ও সকল রস-সম্ভোগ করা যায় না। সাহিত্য-সমালোচনায়, সাহিত্যিকের জীবন-চরিতের বিচার ও আলোচনা এই কারণেই অতিশয় আবশ্যক। অথচ লোকে অনেক সময় সাহিত্য পড়িতে যাইয়া সাহিত্যিকের জীবনের খোঁজ করে না। এদেশে পুরাকাল হইতেই, মনে হয়, এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; কোনও কালে হইয়া থাকিলেও, আমরা যে যুগের সাহিত্য-চর্চ্চার সংবাদ পাইয়াছি, সেকালে তাহা লোপ পাইয়াছিল। এইজন্যই আমরা কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, বা শকুন্তলার পঠন-পাঠন কালে, কালিদাস কোথাকার, কোন্ সময়ের, কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর সংসার-জীবন ও ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত কিরূপ ছিল, তাঁর নৈসর্গিক ও সামাজিক আধার ও আবেষ্টন বা এনভাইরণ্‌মেন্টস্‌ই বা কি ছিল, কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁর অলৌকিক কবিকল্পনা ফুটিয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তিনি হিমালয়ের কোন্ অংশের, কোন্ ছবির, কোন রূপের, কোন্ ভাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ বাস্তব ঘটনার বা রসানুভূতির উপরে তাঁর চিত্রিত কাব্যকলার অপূর্ব্ব রস সকল

স্ফুরিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, এ সকল কোনও দিন জানিবার জন্য ব্যাকুল হই নাই। তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে আমরা কেবল কল্পনারই খেলা দেখি; দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কল্পনা যে সত্যকে ছাড়িয়া জন্মে না, একথাটা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই বলিয়াই, বোধ হয়, কালিদাসের সকল কথার ভিতরকার মর্ম্মও সকল সময়ে ধরিতে পারি না। কালিদাসকে যদি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, মানস-কল্পনাতেও যদি এই অমর-কবির একটি জীবন্ত চলন্ত প্রতিচ্ছবি আঁকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁর সৃষ্টিসকল আমাদের চক্ষে একেবারে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত। তাঁর হিমবৎ, তাঁর মেনকা, তাঁর মহাদেব, তাঁর পার্ব্বতী, আমাদের নিকট কেবল আকাশের দেবতা হইয়াই চিরদিন পড়িয়া রহিতেন না, কিন্তু তাঁর এসকল কাব্য পড়িবার সময়, ইঁহারা ঘরের মানুষ হইয়া, চক্ষে চক্ষে চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেন। এখনও যতটুকু বুঝি ও সম্ভোগ করি, তাহা ইঁহাদের অতিমানবতা নহে, মানবতা মাত্র। রতি-বিলাপের রতি, কামদেবের পত্নী নহেন; কিন্তু আমাদের ঘরের, সমাজের, চিরপরিচিতা পতিবিয়োগ-বিধুরা আধরিণী মাত্র। স্বামীর সোহাগে তাঁর পাতিব্রত্যের প্রকৃতি একান্ত স্বামীগত না হইয়া কতকটা আত্মগত হইয়া পড়িয়াছে। কত সোহাগিনী এইভাবে স্বামীতে আপনাকে ডুবাইতে না পারিয়া, স্বামীর গুণেই স্বামীকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতেছেন! রতি চিতা-রোহণোন্মতা হইয়াও আত্মসুখাভিমানিনী। এ চিত্র কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন, আমরা ঠিক জানিনা। জানিনা বলিয়াই, খুঁটিনাটি ধরিয়া তার বিচার-আলোচনাও করিতে পারি না। এই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের অভাবে, তার পরিপূর্ণ রসবোধও সম্ভব হয় না। সেইরূপ কোন্ মানবী কালিদাসের উমার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া ছিলেন, কোন্ মহাযোগীই বা তাঁর মহাদেবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোন্ বিরহী তাঁর মেঘদূতের মূল-চরিত্র, কোন্ রাজাই বা তাঁর দুষ্মন্ত ও দিলীপ, কোন্ রমণীকে দেখিয়াই বা তিনি তাঁর শকুন্তলাকে আঁকিয়া-

ছেন, এসকলের কোনও সন্ধান আমরা রাখি না, জানি না; কালিদাসের জীবনের কোন্ অঙ্কে, কি সম্বন্ধের ভিতরে এ সকল রসমূর্ত্তির মূল আদর্শ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এইজন্য তাঁর কাব্যকে আমরা কেবল বাহির হইতেই দেখি; তাঁর কাব্যকলার অন্তঃপুরের খবর কিছুই রাখি না ও জানি না। যে প্রণালীতে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাতন বাইবেলের কলা-সৃষ্টির ভিতর হইতে, প্রাচীন ইহুদীয় জাতির একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন, এদেশের প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের কবিকল্পনার ভিতর হইতে যদি কখনও কোনও ভারতীয় মনীষী, যে যে যুগে এসকল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল তত্তৎযুগের এক একটা স্বল্পবিস্তর প্রামাণ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস না হউক, অন্ততঃ এক একটা ঐতিহাসিক কাঠাম গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদির এবং কালিদাস প্রভৃতি কবিকুলগুরুগণের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আমরা এমন জ্ঞান, এমন রস, এমন সত্য, এমন ভাব ও উদ্দীপনা পাইব, যাহা এখন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কাব্যকে লোকে সচরাচর কেবল কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে করে। কাব্যও যে বাস্তবকে ধরিয়া, বাস্তবকে ফুটাইয়া, বাস্তবকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়াই আপনার নিজের সত্য ও সার্থকতা লাভ করে, একথা সকলে বুঝে না। সকল কবিও বুঝেন না, সকল পাঠকে বুঝিবে তবে কিরূপে?

কাব্য কল্পিত সৃষ্টি নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই জীবনের অভিব্যক্তি। মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যেমন সমুদায় বিজ্ঞান বা সায়েন্সের* প্রতিষ্ঠা হয়; এই অভিজ্ঞতার উপরেই যেমন যাব-

---

* আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। যে জ্ঞানের উপরে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকেই ভৃগু "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন। বিজ্ঞান

তীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠে; সেইরূপ এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বপ্রকারের কবিকল্পনারও স্ফুরণ এবং বিকাশ হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতা লইয়াই মানুষের জীবন। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহাকে ধরি ধরি, অথচ ধরিতে পারি না, এই অভিজ্ঞতার ভূমিতে যাহা ফোটে ফোটে কিন্তু ফুটিয়া উঠে না, এই অভিজ্ঞতা যাহার আভাসমাত্র দেয়, কিন্তু যাহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না, কবিকল্পনা তাহাকেই আর একটু পরিস্ফুট, আর একটু জ্ঞানগম্য, আর একটু রসানুভাব্য, আর একটু প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে। কাব্যও এই অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি তাঁর কাব্য। সাহিত্য-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতির অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। শব্দ যেমন অর্থের অভিব্যক্তি, সার্থক শব্দ যেমন সত্য বস্তু বা সত্যভাবের অভিব্যক্তি, সাহিত্য-সৃষ্টিও সেইরূপ সাহিত্যিকের সত্যকার বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। শব্দার্থবোধ যেমন বস্তুজ্ঞানসাপেক্ষ, কাব্য-সৃষ্টির সত্যরসানুভূতি সেইরূপ কবির বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞানসাপেক্ষ। যে কবিকে জানে না, সে তাঁর কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির সত্য ও নিগূঢ় মর্ম্মবোধের জন্য, তাঁর জীবন-চরিতের, তাঁর চরিতালেখ্যের ধ্যান একান্ত আবশ্যক। ঐ চরিত্রই যে এই চিত্রের কলকাঠি।

বঙ্কিম-সাহিত্য বঙ্কিম-চরিত্রের অভিব্যক্তি। ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনওই সে সত্যভাবে বুঝিতে পারিবে না।

বঙ্কিম-চরিত-চিত্রের উপাদান।

এই চরিত-চিত্রের মূল উপাদান বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন। কিন্তু এ

শব্দের এই বিশিষ্ট অর্থটি মনে করিয়াই, আজিকালি বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য, এখানে ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ—সাহায্য—Science কথাটা দিতে হইল।

পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ-ভাবে, বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে দেখিয়াছিলেন ও নানাদিক হইতে সে জটিল চরিত্রের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, "বঙ্কিম-মণ্ডলের" সে সকল সাহিত্যরথী প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্যস্মৃতির শলিতা হাতে লইয়া একমাত্র অক্ষয়বাবুই আমাদের সৌভাগ্যবলে এখনও বাঁচিয়া আছেন। অক্ষয়বাবু এ কাজ করিবেন, কিম্বা এই বয়সে, এই ভগ্নদেহে, তাহা করিতে পারিবেন কি না, জানি না। কিন্তু এ কাজটি যিনিই করুন না কেন, যতদিন না বঙ্কিম-চন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতালেখ্য-রচয়িতাকে নিজেই চারিদিক হইতে যথা-সাধ্য ও যথাসম্ভব তাঁর আলেখ্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এখনও একাজটা কিয়ৎপরিমাণে সহজসাধ্য আছে, আর কিছুদিন পরে অসাধ্য না হউক, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ফলতঃ এখনও আমাদের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পুত্রস্থানীয়দের পক্ষে ততটা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ হইলেও আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগেরই লোক। যে সকল সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল অবস্থার ভিতরেই, মোটের উপরে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সকল জ্ঞান ও ভাবের সংঘর্ষে, যে সকল আদর্শের প্রেরণায় তাঁর অদ্ভুত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের মধ্যে, সেই প্রেরণাতেই আমাদের জ্ঞানও প্রথমে ফুটিতে আরম্ভ করে। যে বিষম যুগ-সন্ধিকালে, বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা-স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া, সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি ঘূর্ণিপাকে পতিত তরণীর মতন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিল; আর যে কালে, যে আবর্ত্তের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাতরণীকে স্থির রাখিবার জন্য,

বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বজ্রমুষ্টিতে তার কর্ণধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; আমরা সেই যুগসন্ধি-সময়ে জন্মিয়া, সেই চিন্তাবর্ত্তের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, বাড়িয়া উঠিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, তাঁর সাহিত্য-জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। এইজন্যই তাঁহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার একটু আধটু অধিকার আছে বলিয়া মনে করি। কারণ এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতালেখ্যের মূল জমি। এটি বুঝিতে পারিলে, তবে বঙ্কিম-চরিত্রের ও বঙ্কিম-সাহিত্যের বিকাশের সূত্রটি ধরা সম্ভব হইবে।

চিরজীব বঙ্কিমচন্দ্র।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনা-কালের আর আনন্দমঠের রচনা-কালের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনিও পরিবর্ত্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন আপনার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোনও দিন তিনি কাল-স্রোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। এইজন্যই মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়াছিলেন। তিনি যে বয়ঃক্রম পাইয়াছিলেন, সে বয়সের অনেক লোকই দেখি মরিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই মৃত হইয়া যায়। সাহিত্য-জগতেও এ সকল জীবন্মৃতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অন্ততঃ আধুনিক সময়ে, অতি অল্প লোকেই মরণকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চান্ন বৎসরকাল ইহলোকে ছিলেন। ইংরাজি-শিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, কর্ম্ম-বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চান্ন বৎ

বাঁচিয়া থাকা, নিতান্ত সামান্য কথা নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবন কেবল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবন কালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এদেশের তিন-জন চিন্তানায়ককে এইভাবে আমরণ বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দুইজনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথা শুনিয়াছি। এক রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনজনেরই জীবনী-শক্তি প্রায় সমান ছিল। তিনজনেই নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, নিত্য নূতন আদর্শ আয়ত্ত এবং নিত্য নূতন রস আস্বাদন করিয়াছেন। ইঁহাদের তিনজনারই জীবন-শতদল দিন দিন নূতন বর্ণে ও নূতন তেজে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এ ফোটা থামে নাই। ইঁহাদের দৈবী প্রতিভার স্বরূপটি নিত্য নূতন অবস্থার ভিতরে, নিত্য নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিশালী প্রতিভামাত্রেই এইরূপ বহুরূপী। নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন সাধনের আবিষ্কার, নূতন রসের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁরা স্রষ্টার গুণ ও ধর্ম্ম লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। স্রষ্টা স্বয়ং যেমন সৃষ্টির জন্য বহু হইয়া থাকেন,—"বহুস্যাং প্রজায়েতি"—প্রজোৎপত্তির জন্য বহুরূপ ধারণ করেন, দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তরগণও সেইরূপই বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রামমোহন এক জন, না বহুজন, বলা কঠিন। "তহফুতুলে" যে রামমোহনের পরিচয় পাই, "বেদান্তসারে" তাঁহাকে চিনা যায় কি? পঞ্চোপনিষদের ভূমিকায় যে রামমোহনকে দেখি, "ব্রাহ্মণ-সেবধিতে", খৃষ্টীয়ান পাদ্রিদিগের সহিত বিচারে, হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক রামমোহন যে সেই রামমোহন, ইহা বলা কঠিন হয়। আবার Three Appeals to

the Christian Publicএতে আর এক রামমোহনকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মসভার সঙ্গীতে—

স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য, দুই সহায়-সাধনে—

যে রামমোহনের পরিচয় পাই, বিলাতের রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠতম রস-মূর্ত্তি সকলের প্রতিষ্ঠাত্রী ইংরাজ-অভিনেত্রীদের কাব্যরসানুশীলননিপুণ রামমোহনে আর এক ভাব ও আর এক আদর্শ দেখিয়া থাকি। অথচ এসকল বহু রূপের ভিতরে একটি স্বরূপই, দেশকাল-পাত্রাদির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, নব নব মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিকাশ ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। আদিব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র, ভারতবর্ষীয় সমাজের কেশবচন্দ্র, নববিধানের কেশবচন্দ্র, ঠিক একই ব্যক্তি কি না, কেবল বাহির হইতে বিচার করিয়া এ সন্দেহের নিরসন করা যায় না। আমরা তাঁহাকে একব্যক্তি বলিয়া দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, সেইজন্যই এ সন্দেহ আমাদের মনে উঠে না। সুদূর ভবিষ্যতে কেশব-সাহিত্য পুরাণে ও কেশব-চরিত্র কিম্বদন্তিতে পরিণত হইলে এই সমস্যা যে উঠিতে পারে না, বা উঠিবে না, এমন কথা বলা যায় না। বঙ্কিম-চন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর স্রষ্টা যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহাকেই আবার কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বা গীতাধর্ম্মের উপদেষ্টা বলিয়া চিনা কঠিন হয়। তাঁর চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবস্থায় যেমন পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈবীপ্রভাও তেমনি, এ সকল পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নূতন সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে জয়শ্রী কেবল সংগ্রাম-ক্ষম প্রতিবন্ধীবল-প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না; দুর্দ্ধর্ষ শক্তির সঙ্গে সুনিপুণ নীতি যেখানে সম্মিলিত হয়, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়া রহেন। জীবনের সঙ্কেত কেবল প্রতিকূল শক্তির

প্রতিরোধের সামর্থ্যেই লুকাইয়া রহে না, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে জানে না; যে কেবলই প্রতিবাদপরায়ণ, কিন্তু সমন্বয়পারগ নহে; তাহার পক্ষে জীবনসংগ্রাম কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অফুরন্ত উপচয়ের পন্থা হইয়া উঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির নিপুণতা, এই সমন্বয়ের সামর্থ্য, এই উপচয়ের কুশলতা বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তাঁর মনীষার ও অদ্ভুত মানসিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই শক্তির বলেই তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক হইয়া ছিলেন। মৃত্যুর পরেও ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিতে চলিল, কিন্তু বঙ্কিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই; অপচিত হওয়া ত দূরের কথা, দিন দিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর যুক্তিবাদী ছিলেন, সে যে যুক্তিবাদেরই যুগ ছিল। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া ইউরোপের প্রবল যুক্তিবাদকে পরিহার করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মহর্ষিপদার্হ দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই; প্রবক্তা ধর্ম্মী কেশবচন্দ্র তাহা পারেন নাই, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যে এ যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুইজনে স্বল্পাধিক অজ্ঞাতসারেই এই অভিনব যুক্তিবাদকে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের আবরণে, ফলতঃ এই যুক্তিবাদকেই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি, কতকটা ডিপ্লোমেসীর (diplomacy) পথেই যেন এই যুক্তিবাদের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া চলিয়াছিল; প্রকাশ্যভাবে তাহাকে একেবারে গ্রহণও করে নাই; অকুতোভয়ে সম্মুখসমরে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতেও চেষ্টা করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইউরোপের এই আধুনিক যুক্তিবাদকে আপনার অন্তরে অকুণ্ঠাসহকারেই বরণ করিয়া

লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহাকে বলে, বঙ্কিমচন্দ্র ইহা জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। "পাছে লোকে কিছু বলে"—এ ভাবনা তাঁর কখনও ছিল বলিয়া বোঝা যায় না। না থাকারই কথা। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মোপদেষ্টার পক্ষে একান্তভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁহারা প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে দণ্ডায়মান হন, তাঁরাও দু'দিন পরে, আপনাদের কর্ম্মের ও ধর্ম্মের—আপনাদের মিশনের—খাতিরে, নিজেদের দলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সমাজের আনুগত্য ছাড়িয়া অনেক সময়ই ইঁহাদিগকে নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিত্বাভিমান ও যুক্তিবাদ উভয়ই এখানে শেষে হার মানিয়া যায়। লোকনায়ক হইলেই লোকরঞ্জন করিতে হয়। যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তখনই তাহাকে আর প্রকাশ্যে চিন্তায় ও কর্ম্মে, আচারে ও অনুষ্ঠানে বরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিপত্তি হানির ভয়ে না হউক, অন্ততঃ লোকহিতার্থায়, ধর্ম্মের খাতিরেই, অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

সাহিত্যের সন্ন্যাস।

কেবল যাঁরা খাঁটি সন্ন্যাসী তাঁরাই সর্ব্বদা নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া চলিতে পারেন। আর পারেন যাঁরা খাঁটি কবি। যাঁরা নিজের রসেই নিজে ভোর, নিজের সৃষ্টিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, নিজের সৃষ্টি-কলার অনুধ্যানে ও বহিঃ-প্রকাশেই যাঁরা আত্মারাম হইয়া রহেন, যাঁদের জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্তুতিবাদে নহে, যাঁদের কর্ম্মের সাফল্য সেই কর্ম্মেরই মধ্যে যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের প্রতিপত্তি-বিপত্তির মধ্যে নয়; সেই সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও, খাঁটি সন্ন্যাসী। অলৌকিক প্রতিভার একটা আত্মসম্ভাবিতভাব সর্ব্বদাই থাকে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভাবিতভাবও নহে, কিন্তু অনেক সময় ইহাকে

লোকে self-conceit বলিয়াই ভুল বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা self-conceit নহে, self-confidence মাত্র। আপনার উপরে এই একান্ত নির্ভরটুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল আস্থাটুকু যাঁর নাই, তাঁর কোনও প্রতিভা আছে বলিয়াই বিশ্বাস করা যায় না। ইহা অহঙ্কার নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে পারে না, তাহাও তেমনি বুঝে। নিজের সাধ্যাসাধ্যের জ্ঞান সাধারণ লোকেরই থাকে না, সেইজন্য তাহাদের অহঙ্কারও শোভা পায় না, বিনয়েরও কোনও দাম হয় না; দু'ই কল্পিত,—মিথ্যাভিমান এবং অলীকাভিনয় মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মনির্ভর ও বিনয় দু'ই খাঁটি বস্তু। সত্য সত্যই একক্ষেত্রে "উজ্জ্বলে মধুরে" মিলিয়া যায়, মিশিয়া রহে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই self-confidence তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভারই উপযোগী ছিল। এ ব্যক্তি কোনও দিন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও মুখাপেক্ষী হন নাই, নিজে দল বাঁধিয়া, সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধা পড়েন নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহাকে যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, নিজের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি যখন যে পথে চলিতে চাহিয়াছে, অকুতোভয়ে, অকুণ্ঠাসহকারে তাহাই বলিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতন নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে; কিন্তু কৃমি-প্রকৃতিসুলভ বক্রতা ও পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা মুক্তভাব ছিল বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও দিন চারি-দিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তৃণের মতন ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপরে

উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্যনূতন রসে, নিত্যনূতন জ্ঞানে, নিত্যনূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বসুন্ধরা যেমন ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতাসাধনে নিয়োগ করে; প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ, যাহা বর্জ্জনীয় তাহাকে বর্জ্জন করিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিকেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে। শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে মায়িক এবং অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না; কিম্বা তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন না, কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতাসাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন। বাঙ্গালাদেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে, ত্রিশচল্লিশ বৎসরকাল, বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই অধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্য প্রতিযোগী ও সর্ব্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথের ন্যায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাবস্রোতের আগে আগে তাঁহার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সকলের আগে তাঁর সময়কার নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের আধুনিক চিন্তার ইতিহাসটি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই ইতিহাসটিই বঙ্কিম চরিতালেখ্যের মূল জমি। ঐ আলেখ্যটিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে আগে এই জমিটিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলা আবশ্যক।

কিন্তু জমির গুণ বুঝিবার আরও আগে বীজের বৈশিষ্ট্য এবং

শক্তিটা জানা প্রয়োজন। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সেই কথাই আগে কহিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি মহাশয় ঠাকুরদাস বাবুর এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি "নারায়ণে"র বঙ্কিম-সংখ্যার জন্য পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন—নাঃ সঃ।]

১২৯০ সালে, বঙ্কিমবাবুকে আমার দ্বিতীয় বার দেখার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে বঙ্গদেশের বহুদূর হইতে আমরা এক কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার; ব্যাপারটা কিছু বিসদৃশও ছিল বটে। সে ব্যাপারের সহিত আমার বহু স্মৃতি বিজড়িত;—তাহা বরং বারান্তরে বলিব; আপাততঃ তাহা হইতে বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতিটুকুই যথাসম্ভব ছাঁকিয়া লইতেছি।

আমাদের ঐ কাগজ বাহির হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পরে হিন্দুধর্ম্মান্দোলনের বা হিন্দুধর্ম্মের তথা-কথিত "পুনরুত্থান" উন্মেষিত হয়। বঙ্কিমবাবুর লেখনী সেই সর্ব্বপ্রথম স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত। বঙ্কিমবাবুর নাম সংযুক্ত ও লেখনী নিযুক্ত হওয়াতে শিক্ষিত সমাজে, বিশেষতঃ সাহিত্য-সমাজে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছিল; এবং অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মধ্যে ঐ আন্দোলন আত্ম-

সামর্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারগ হইয়াছিল; ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। ধর্ম্মালোচনা মুখে করিয়া "নবজীবন" ও "প্রচার" একই মাস মধ্যে উভয়ে আবির্ভূত হয়। অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে সেটা ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস। আমাদের পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছিল উহার কয়েক মাস পূর্ব্বে, ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে। "নবজীবন" ও "প্রচার" ছিলেন মাসিক; আমাদের পত্রখানা হইয়াছিল পাক্ষিক; এবং সাহিত্যাদির সমালোচনাই ছিল তাহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। উক্ত আন্দোলনে এবং তদুপলক্ষে 'নবজীবনাদি' নূতন নূতন পত্রের আবির্ভাবে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বড় বড় লোকের নূতন লাইনে নিয়মিত লেখনী চালনায়, আমরা সমালোচনার এক মহাসুযোগ পাইয়াছিলাম। আমরা সে সুযোগ যথাসাধ্য ছাড়ি নাই; সবিশেষ আগ্রহেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমি প্রথম ও পরোক্ষে বঙ্কিমবাবুর নিকট কিছু পরিচিত হই। আমরা প্রধান প্রধান পত্রের ও প্রবন্ধ মাত্রেরই সমালোচনা করিতাম; তাহার মধ্যে অবশ্য আসরের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধগুলি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের বিশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সবিশেষ সমালোচনা করিতাম। সেগুলি সবই আমি নিজে লিখিতাম। প্রবন্ধে, প্যারায়, সারসংগ্রহে এবং সহযোগী সাহিত্য-অভিধেয় সন্দর্ভে সমালোচনার তীব্র তুফান ছুটিত। বঙ্কিমবাবুই হউন আর যিনিই হউন, বাগে পাইলে আমরা কাহাকেই ছাড়িয়া কথা কহিতাম না। তখন সাহিত্যালোচনার নবানুরাগ কিনা! সকলকেই মিঠা-কড়া বিলক্ষণ দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া যাইত। সমালোচনার আর আর বিষয়ের যতই অভাব থাকুক সাহসের সদ্ভাবটা সম্পূর্ণ মাত্রাতেই থাকিত। তবে শিষ্টাচার ও সভ্যতার সীমা সর্ব্বথা উল্লঙ্ঘন করিতাম না; শ্রদ্ধেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কখনই কুণ্ঠিত হই নাই। সহৃদয়তা ভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনা সম্ভবে না, সৌভাগ্যক্রমে সে শিক্ষাটা অন্যান্য অনেক শিক্ষার অভাবসত্ত্বেও তখন হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবু, আমাদের ঐ পাক্ষিক পত্র, শুনিয়াছিলাম, প্রায়ই পাঠ করিতেন। তাঁহার নিজের প্রবন্ধের ও অভিমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা উহাতে কখনও থাকিলেও বিরক্ত হইতেন না; এবং অনেক দূর হইতে ও অন্যের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বরং আমাদিগকে উৎসাহিতই করিতেন; আমাদের অভিমত তাঁহার সপক্ষে বা বিপক্ষেই হউক, আমাদের সমালোচনা প্রণালীতে প্রীত হইতেন; প্রশংসাও কিছু না করিয়াছিলেন, এমন নয়। আমাদের কোনও পরিচিত ব্যক্তির সহিত একদিন তাঁহার এ বিষয়ের কথা হওয়াতে, শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছিলেন,—"এঁরা বেশ করিয়াছেন; এরূপ একখানি পত্র থাকার খুব প্রয়োজন আছে।"

পুনঃ আর একদিন 'পাক্ষিকের' কথা উঠাতে বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি,—"অন্য কার্য্য করিতে করিতে; প্রতিপক্ষে এরূপ একখানি কাগজ বাহির করা কঠিন বটে; তা' পাক্ষিককে মাসিক করিয়া ফেলুন না কেন? মাসিক করিতে বলিও।"

বলা আবশ্যক আমরা যে কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া এই পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আপিসে চাকুরি করিতাম। চাকুরি করিতে করিতেই এই পত্রের পরিচালনা করিতে হইত। তজ্জন্য সকলেরই, বিশেষতঃ এই লেখকের প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। রাত্রিদিন খাটিয়াও কূল পাইতাম না। বঙ্কিমবাবুর কথা অনুসারে পাক্ষিককে মাসিক করিলে মন্দ হইত না; তাহাতে তত দোষও হইত না। বিলাতের "ফর্টনাইটলী রিভিউ" মাসে মাসেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের পাক্ষিককে মাসিকে পরিবর্ত্তিত করি নাই। যত দিন ঐ পত্রের পরমায়ু ছিল, প্রতিপক্ষেই প্রকাশিত হইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর "দেবী চৌধুরাণী" প্রকাশিত হয়। আমি ঐ পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করি। তাহা আমাদের পাক্ষিকেই

প্রকাশিত হয়। আর কোন কাগজেই দেবী চৌধুরাণীর অত বড় বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ভূদেববাবু ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং "এডুকেশন গেজেটে" "উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার পুস্তকের ঐ সমালোচনা দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোনও বন্ধুর নিকট সমালোচকের তত্ত্ব লইয়াছিলেন।

এইরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট আমি প্রথম পরিচিত হই। কিন্তু এ পরোক্ষ পরিচয়। তখন এবং তাহার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাই ছিল না; কারণ বিদেশে ছিলাম। দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরে কখনও সংবাদ জিজ্ঞাসাও হয় নাই। আমি উপরোক্ত পরোক্ষ পরিচয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি না করিতে পারিতাম এমন নহে; কিন্তু তাহা করি নাই। ঔদাসিন্য বশতঃ তাহা করি নাই; এমন কেহ বুঝিবেন না। বঙ্কিমবাবুর নিকট পরিচিত হইতে কাহার না একান্ত ইচ্ছা হইত? অতএব বলা বাহুল্য আমারও সে ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী ছিল। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার কেমন একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং তাহা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তাঁহার অতুলনীয় রচনাবলীই আমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করে,—সে এক অনিবার্য্য আকর্ষণ। কত সময়ে কত লোকের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দা-কুৎসার কথা শুনিয়াও আমি সে আকর্ষণ সম্বরণ করিতে পারি নাই। অতি দূরে, তাঁহার অপরিচিত ও অজ্ঞাত থাকিয়াও তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রকৃতই বলিতেছি, সে অনুরাগ হৃদয়ের অকৃত্রিম, অবিমিশ্র বস্তু। তাহার সহিত সংসারের স্বার্থাস্বার্থের কিছু-সংস্রব ছিল না; তাহা পরিচয়ের প্রত্যাশা করিত না; বাক্যালাপের বা চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের জন্য আদৌ ব্যস্ত ছিল না। বঙ্কিম-

বাবুর লেখাই আমাকে তাঁহার প্রতি অবিচলিতভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখিতে প্রচুর ছিল। একজনের মানসিক শক্তি অপরকে এতাদৃশ বিমোহিত করিয়া রাখিতে পারে আমি অগ্রে জানিতাম না। এরূপ লুব্ধাবস্থা যে ভাল তাহা আমি বলি না; কারণ ইহাতে সমালোচনার সুবিচারের ব্যাঘাত হয়। বঙ্কিমবাবুর সব লেখা, সমস্ত ভাব, যাবতীয় কল্পনা ও কবিত্ব-চিত্র, চরিত্র এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য, সমুদয়ই যে আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতাম বা এখনও বুঝিতে পারি, এমত অহঙ্কার করি না। কিন্তু, তাঁহার নির্ব্বাচিত প্রত্যেক অক্ষরই আমার মনের উপর কার্য্য করে, আমি যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হই। ইহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। বঙ্কিমবাবুর বার্দ্ধক্যের বিনয়ের ন্যায় তাঁহার যৌবনের ঈষৎ আত্মগরিমাও আমার নিকট উপাদেয়। আত্মগরিমা অতীব দূষণীয় ইহা আমি অবশ্য জানি এবং মানি, কিন্তু উহা বঙ্কিমবাবুর বলিয়া আমি মনে মনে উহার আদর করি। সমালোচকের শক্তি বা সুবিচার প্রদর্শনার্থে, বঙ্কিবাবুর যাহা ভাল নয় বলিয়া হয় ত আমি সমালোচনা করিয়াছি, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাও আমি অন্তরে অন্তরে ভালবাসি। অপর একটি লেখকের রচনা সম্বন্ধেও আমার ভালবাসা উপলক্ষে এই উক্তি বর্ত্তে। কিন্তু এই সকল কথা এতটা খুলিয়া বলাতে হয় ত আমার আত্ম-অসঙ্গতি ও মনের অসামঞ্জস্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তাহাতে আমি নাচার। যখন আমি আমার স্মৃতি ও স্বাভাবিক অনুরক্তির কথা ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, তখন সব কথাই খুলিয়া বলিতে আমি বাধ্য। ফলতঃ ভাল বলা বা মন্দ বলার উপর ভালবাসাটা বড় বেশী নির্ভর করে না বলিয়াই আমার বোধ হয়। যাহা ভালবাস তাহা ভাল নয় বলিয়াও তুমি ভালবাসিতে বাধ্য। ভাল নয় বলিয়াই ভালবাসাতে "রোক শোধ" দেওয়া যায় না। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আপন স্থান অধিকার করে। বড়ই আত্মরক্ষণক্ষম এই ভালবাসা। যাহা তুমি একবার সুন্দর বলিয়া দেখি-

য়াছ, তাহা অসুন্দর করে সাধ্য কার? সমালোচনার শত অস্ত্রাঘাতে, বিদ্রূপের ধারা-শ্রাবণ বর্ষণেও তুমি তাহা হইতে তোমার অনুভূত সৌন্দর্য্যের এক বিন্দুও বিনষ্ট করিতে পার না।

আমি বঙ্কিমবাবুর বিনয় অপেক্ষা তাঁহার বিদ্রূপকে বেশী ভালবাসি, কারণ শেষোক্তকেই সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম এবং সাহিত্যাংশে সুন্দর বলিয়া দেখিয়াছিলাম। পরন্তু, বঙ্কিমবাবু ইদানীং তাঁহার প্রথম জীবনের কোন কোনও লেখা পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি প্রীত হই নাই; এবং বিষণ্ণ ও বিরক্তই হইয়াছিলাম। "সাম্য" শেষ অবস্থায় মারা পড়িল কেন? বঙ্গদর্শনের শ্রীকৃষ্ণ-সমালোচনা ধ্বংস হইল কেন? শেষাবস্থার শ্রীকৃষ্ণ সমালোচনা অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইলেও, প্রথমাবস্থার প্রবন্ধটির পরিবর্জ্জন আমার পছন্দ হয় নাই। ইহা আমার—বঙ্কিমবাবুর জনৈক পাঠকের ও উপাসকের মনের খেয়াল মাত্র; হয় ত আর কিছুই নহে। আগষ্ট কোমৎ শেষাবস্থায় আত্মমতের কতকাংশ পরিত্যাগ করায়, বঙ্কিমবাবু একদিন বঙ্গদর্শনে যে পরিতাপ করিয়াছিলেন, আমিও বঙ্কিমবাবু নিজের কোন কোনও রচনা প্রত্যাহার করায়, সেই পরিতাপ পুনঃরুক্ত করি।

বঙ্কিমবাবুর লেখা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতে ও লিখিতে সাধ গিয়াছিল। তাঁহারই কথা আমার ন্যায় কীটাণুকে সাহিত্যের সুবিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই লেখা হইতেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সাহিত্য-প্রীতি জন্মিয়াছিল; সাহিত্যের সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে প্রণোদিত ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নহিলে আমার মত মূর্খ লোকে কখনই সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিতে সাহসী হইত না। বঙ্কিমবাবু, তাঁহার উত্তরচরিত সমালোচনার একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "যদি ইহার" (উত্তর সমালোচনার) "দ্বারা এক জন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্য-রস-গ্রাহিণী-শক্তির কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল

বিবেচনা করিব।" এখানে আমার বলা আবশ্যক যে বঙ্কিমবাবুর আকাঙ্ক্ষিত সেই "একজন পাঠক" আমি, অথবা আমি অনেকের মধ্যে একজন। বঙ্কিমবাবুর উক্ত সমালোচনা পাঠ করিয়াই আমি কাব্য রসাস্বাদ-শক্তির অনুশীলন করি ও সমালোচনা-তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। সাহিত্য-শালায় বঙ্কিমবাবু আমার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাগুরু; পরে দেশে বিদেশে বিস্তর শিক্ষক পাইয়াছি বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এবং (বোধ হয়) প্রধান শিক্ষক।

অতএব বলা বাহুল্য, বলা আদৌ অসম্ভব যে, বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিমাণ কি এবং প্রগাঢ়তা কত ছিল। কিন্তু তাহা যতই থাকুক আমি সে কথা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; বঙ্কিমবাবুর নিকট বলিয়া পাঠাইবারও প্রয়োজন বোধ করি নাই। বঙ্কিমবাবুর নিকট পরিচিত হইবার ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর ইচ্ছা হইত তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার আলাপ ব্যবহার অধ্যয়ন করিতে। তবুও কিন্তু, উপরোক্ত পরোক্ষ পরিচয়ের উপর এক বিন্দুও উন্নতি করিতে পারি নাই। আসল কথা এই যে, "উপরপড়া" হইয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা, আলাপ করা বা চিঠিপত্র লেখা আমার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ। সেজন্যও বটে এবং উপরোক্ত যৎসামান্য উপলক্ষে তাঁহার নিকট আমার পরিচয় প্রশস্ত করা অযোগ্য বিবেচনায় তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু উহার কয়েক বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা বঙ্কিম-বাবুর নিকট আমার পরিচয় পরোক্ষে আর একবিন্দু বর্দ্ধিত করিয়া-ছিল।

পাক্ষিকে লেখা আরম্ভ করার সময় হইতেই আমার লেখার ঝোঁকটা সাংঘাতিক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। (অসম্পূর্ণ)।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।